স্পর্শক
সুচরিত সরকার

সপ্তম শ্রেণীতে একটা তৃতীয় ভাষা নিতে হল, মানে বাংলা ইংরিজি তো ছিলই, কিন্তু এবার আরো একটা ভাষা শিখতে হবে, হিন্দী অথবা সংস্কৃত। আমাদের স্কুলের সাগরসমান নশোএকষট্টিজন ছাত্রগণের সিংহভাগ নিল হিন্দী, আর আমরা টিমটিমে কজন চয়ন করলাম সংস্কৃত। ষষ্ট শ্রেণী অবধি সকালে ছটা ঘর ছিল (আর দুপুরে আরো সাতটা, তবে তাদের কথা আজকে থাক), তারা তাদের মতনই রইল, আর প্রতিটি ঘর থেকে আমরা গুটিকজন যারা সংস্কৃত নিলাম, তাদেরকে একত্রিত করে একটা নতুন ঘর নির্মাণ করা হল, সংস্কৃত কক্ষ। সংস্কৃত ছাত্রেরা ছিল প্রধানত তিনপ্রকারের। প্রথম দল অবাঙালী, মূলত দাক্ষিণাত্য বা মারোয়াড়দেশীয়, যাদের জন্য সংস্কৃত ছিল বাধ্যতামূলক (কারণ তাদের প্রথম দুটো ভাষা হিন্দী আর ইংরিজি, তাই হিন্দী তৃতীয় ভাষা হবার আর অবকাশ নেই), তারা মলিন বদনে একধারে বসে বাকি আমাদের বাঙালীদের দেবনাগরী অক্ষর শেখার করুণ প্রয়াসের প্রতি নজর রাখতো। দ্বিতীয় দল (বা তাদের মা-বাবারা) সংস্কৃতিমনষ্ক, সংস্কৃত ছেড়ে হিন্দী নেওয়ার কথা তাদের (বা তাদের বাড়ির লোকেদের) কল্পনার অতীত। এ দলে পড়তাম আমি, কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর নাতি, বাড়িতে দাদু, তারপরে মা, আর তারপরে আমি, আমাদের তিনজনের সম্মিলিত একটাই ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমার নাম গোরার এক চরিত্রের অনুকরণে), বাড়িতে রবিবাবু ছাড়া জীবনানন্দ দাশ বা বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় টুকটাক চলতে পারে, কিন্তু তারপরে গৃহের সিংহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রোখা, সুতরাং সংস্কৃত নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি (বা প্রবৃত্তি) ছিল না আমার। আমি ছাড়া আরো কিছু সাহিত্যিকদের নাতিনাতনিরাও ছিল, যেমন বসুভদ্রের বা রমাপদ চৌধুরির, তারাও ছিল এই দ্বিতীয় দলের সদস্য। আর এ ছাড়া ছিল এক তৃতীয় দল, তাদেরকে ইংরিজিতে সভ্যভাবে বলে নন-কনফর্মিস্ট, বাংলায় অসভ্যভাবে বলে গাম্বাট, দৃঢ় কন্ঠে "সবাই হিন্দী নিয়েছে তাই আমি সংস্কৃত নেবো" বলে তারা গঠন করলো তৃতীয় গোষ্ঠী। অনতিবিলম্বে সেই নন-কনফর্মিস্টরা নিজেরা একে অপরের মধ্যে কনফর্ম করে নিল, আর নন-কনফর্মিস্টদের মধ্যেও নন-কনফর্মিস্ট, গাম্বাটদের মধ্যেও গাম্বাট, হয়ে পড়ে রইল কেবল একজন। অতি উৎসাহভরে আলাপ করলাম তার সাথে, সপ্তম শ্রেণীর সংস্কৃত কক্ষে দেবদীপের সাথে আমার সেই প্রথম পরিচয়। আমার উত্তমের সাথে নিশ্চিন্ত অধম, আমার শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ, আমার ওয়ার্ডসওয়ার্থের ম্যাথিউ, আমার চার্লস ডার্ণির সিডনি কার্টন, আমার টিনটিনের ক্যাপ্টেন হ্যাডক, ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিসটোফিলিস, দেবদীপ ভট্টাচার্য।

আলাপ তো হলো, কিন্তু বন্ধুত্ব হতে সময় লাগলো আরো এক বছর। আমরা প্রতি বছর একটা করে নীল রঙের বাঁধাই করা ডায়েরি পেতাম, সে ডায়েরির যে কী ঠিক প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা, আমার মনে হয় না সাউথ পয়েন্টের ইতিহাসে কেউই তা মর্মোদ্ধার করতে পেরেছে। কেউ সে ডায়েরিতে কবিতা লিখতো, কেউ বা ছবি আঁকতো, কেউ কেউ আবার শেষের বেঞ্চে বসে তাতে বুক ক্রিকেট খেলতো। আমি অবধারিত বছর শেষের মধ্যে সে ডায়েরি হারিয়ে ফেলতাম, কিন্তু হারানোর আগে অবধি সে ডায়েরির প্রতি পাতার তলায় যে চালাক চালাক ইংরিজি বক্রোক্তি থাকতো, সেগুলো মুখস্থ করতাম। (তাদের কয়েকটা জীবনে অনেকবার কাজে লাগিয়েছি, যেমন, "যখন কোনো বোকার সাথে ঝগড়া করছো, মনে রেখো সেও তাই করছে", "কিছু করতে চাইলে করে ফেলো; অনুমতি নেওয়ার থেকে ক্ষমা চাওয়া বেশি সোজা", প্রভৃতি।) দেবদীপের সাথে আমার আত্মিক যোগসূত্রপাতের জন্য ডায়েরি যে উক্তিটি সর্বাগ্রে প্রযোজ্য, সেটি হল চেকভ সাহেবের: "লাভ ফ্রেণ্ডসিপ এণ্ড রেসপেক্ট ডু নট ইউনাইট পিপল এস ডাস আ কমন হেট্রেড ফর সামথিঙ্গ"। আর এই কমন হেট্রেডের জালে কেবল আমি আর দেবদীপই ধরা পড়লাম না,ধরা পড়লো আরো দুই চরিত্র, অভিষেক বসু আর প্রিয়ক পুরকায়স্থ।

জীবনে অনেক চরিত্র এসেছে, তাদের কেউ জড়িয়ে গেছে জীবনের সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে, কেউ বা হারিয়ে গেছে চোরানদীর বাঁকে, কারুর কারুর সঙ্গের প্রতিটি মুহূর্ত এখনো বিমল আভায় দীপ্যমান, আবার কারুর কারুর নাম বা মুখ আজ বিস্মৃতির মলিন আলোয় আবছা। তাদের সবার কথা আবার করে ভাবতে গেলে ভালো লাগে, বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় নস্টালজিয়ার ছোঁয়ায় পুলকিত হয়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবন। জীবনের সে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ নিয়ে হয়তো খানকয়েক উপন্যাস রচনা করা যায়, কিন্তু পাঠকের প্রতি তাতে অবিচার করা হয়, বিশেষ করে যে পাঠকের এই চরিত্রগণের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। আজ দেবদীপের কথা বলতে এসেছে, তাই আমার আর দেবদীপের সঙ্গে যারা একই নাটকের একই দৃশ্যে একই রঙ্গমঞ্চে ছিল, কেবল তাদের কথাই বলবো, তাও যথাসম্ভব সংক্ষেপে, আর বাকি যারা আগের বা পরের দৃশ্যে ছিল, তাদের সবাইকে থাকতে হবে আজ ব্যাকস্টেজের অন্ধকারে।

অভিষেক বসু ছিল আমার স্কুলজীবনের আদর্শ। আমি হিন্দু, তাই আমার অনেক ভগবান, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতে হেমন্ত, অঙ্কে রীমান, ইত্যাদি, কিন্তু এনারা সবাই ধরাছোঁয়ার বাইরে, কেমন যেন অতিজাগতিক মনে হয়। কিন্তু ধরিত্রীর বুকের ভেতর থেকে কিছু রক্তমাংসের মানুষের সাথেও পরিচয় হয়েছিল, যাদের সাথে হাসিঠাট্টা করেছি, নিজের অত্যন্ত আপন করে নিতে পেরেছি, এবং স্বর্গে বিরাজমান উপরোক্ত ভগবান না হোক, তাদেরকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নিজের জীবনের ধ্রুবতারা রূপে দেখেছি, অভিষেক তাদের মধ্যেই একজন (ভবিষ্যতে কলেজজীবনে ধ্রুবতারা হয়েছে মহেশ, য়ুনিভার্সিটিতে ড্যানিয়েল, ইত্যাদি)। আমরা স্কুলে সবাই অভিষেককে বাসু বলে ডাকতাম। আমাদের প্রজন্মের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত নাম ছিল অভিষেক (কিছুকাল পরে সেটা হয় রাহুল, ইদানিং ঈশান নামটা অনেক শুনতে পাই)। স্কুলের প্রায় প্রতিটি ঘরেই একাধিক অভিষেক ছিল, আমরা সংস্কৃত ছাত্ররাও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না, আমাদের ছিল অভিষেক চৌধুরি আর অভিষেক বসু, তাই মুহূর্তান্তেই তারা নবনামাঙ্কিত হল, চৌধুরি আর বাসু। আমরা সবাই সারাক্ষণ এতই বাসু বাসু করতাম যে ওর আসল নাম যে অভিষেক সেটা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম (আর অন্য ঘরের অনেকে সেটা জানতোও পর্যন্ত না), কেবল ওর পাশের পাড়ার শান্তনু ওকে অভিষেক বলে সম্বোধন করতো, আর তা নিয়ে আমরা শান্তনুকেই ক্ষেপাতাম। একদিন হয়েছে কি, কিছু একটা দরকারে অভিষেককে ফোন করেছি, তখন তো মোবাইল ফোনের গল্প নেই, ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ল্যাণ্ডলাইনে ফোন। (তাতে সুবিধে ছিল যে ফোন নম্বরগুলো মনে থাকতো, আজো মনে আছে, অভিষেকের ২৪৭৩-০৩৮৩, দেবদীপের ছিল ২৪৭৯-২৬৭৮, আরো কিছু নম্বরও মনে আছে, বিশেষ করে সন্দীপের ২৪৭৩-৬৩৫৯, কারণ সেটা ছিল আমাদের বাড়ির নম্বর ২৪৬৪-৪৩৫৯-এর মত।) ওদিকে ফোন ধরেছেন অভিষেকের বাবা, বেশ সদর্পে বললাম, "বাসু আছে?" গম্ভীরকণ্ঠের উত্তর এল, "কোন বাসু? আমাদের বাড়িতে সবাই বাসু।" তৎক্ষণাৎ সরি বলে ভুল সুধরোলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ঝোলায় আরো একটা মজার গল্প সংগ্রহিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওদের বসুবাড়ির অধীনেই বসুশ্রী সিনেমা (আমরা হিসেব করেছিলাম, অভিষেক বোধ করি বসুশ্রীর ১/৯ মালিক), তাই বিনাপয়সায় অভিষেকের সাথে বসুশ্রীতে অনেক সিনেমা দেখেছি, "জেঠু কেমন আছো" বলে সদলবলে অভিষেক ঢুকে পড়তো সিনেমাহলে, সানি পাঁজির অবিস্মরণীয় বর্ডার সিনেমাটা ওভাবেই দেখা। অভিষেকের ডাকনাম সায়ন, তাই ওর অত্যন্ত কাছের কিছু বন্ধু, যেমন সন্দীপ আর শ্রেয়ার্থ, ওকে সায়ন বলেই ডাকতো। স্কুলজীবনের শেষলগ্নে একদিন অভিষেক ডেকে বলেছিল, "প্লিজ তুই আমাকে সায়ন বলে ডাকিস, তোর থেকে বাসু ভালো লাগে না", সেটা ছিল স্কুল ছাড়ার আগে আমার অন্যতম বড় প্রাপ্তি।

প্রিয়ক ছিল সংস্কৃত ঘরের ভালো ছেলে। দৈবক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে প্রিয়কের সাক্ষাৎ পরিচয় হলে তিনি নির্ঘাৎ গোপাল কেটে লিখতেন "প্রিয়ক অতি সুবোধ বালক"। পরীক্ষায় ভালো ফল করা কিছু ছাত্রদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর তাদের মায়েদের কাছে ছিল প্রাণেশ্বর প্রাণাধিক। (এটা অবশ্য আমাদের স্কুল বা আমাদের কালের বিশেষত্ব নয়, আদি অনন্তকাল ধরেই বঙ্গভূমিতে এই রীতি বর্তমান।) প্রতিটি শ্রেণী থেকে সহস্রজন ছাত্রদের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজন র‍্যাঙ্ক পেত, তারা "র‍্যাঙ্কার", আর প্রতিটি ঘর থেকে যারা র‍্যাঙ্কার, তারা ছিল সে ঘরের তারকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নয়নের মণি, আর বাইরে অপেক্ষারত মায়েদের নজরবন্দী পাত্র। সব ঘর মিলিয়ে প্রথম হত রুদ্রজিৎ পাল ("অল-সেকশন ফার্স্ট"), দ্বিতীয় হত অনিন্দ্য, এরা ছিল নায়কদের মধ্যেও মহানায়ক, আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত নয়নে এদের দেখতাম। এরা দুজনেই সকালের, তাই তারা ছিল আমাদের সকালের ছাত্রদের বিশেষ গর্বের বিষয়। তার পরবর্তী দশ-বারোটা র‍্যাঙ্ক পেত দুপুরের নক্ষত্রমণ্ডল (কৌশিক, শুভ্রশেখর, অভিস্নাত, প্রমুখ), তারা ছিল (রুদ্রজিৎ আর অনিন্দ্য ব্যতীত) আমাদের সকালের ছাত্রদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু তাদের ঠিক পরেই আমাদের সংস্কৃত ঘরের আমাদের নিজস্ব তারকা ছিল (অভিষেক) চৌধুরি আর প্রিয়ক। (আমিও কালেভদ্রে হ্যালির ধূমকেতুর মতন ঢুকে পড়লাম র‍্যাঙ্কারদের গ্রহবৃত্তে, কিন্তু অবধারিত পরের পরীক্ষার মধ্যেই ফিরে যেতাম আমার চিরপরিচিত ব্যাকবেঞ্চারদের ঊর্ট মেঘরাশিতে।) আমরা তখন বাসেট্রামে করে একা একাই যাতায়াত করি। সময় থাকলে ট্রাম নিতাম, বালিগঞ্জ ডিপো থেকে ২৭ নম্বর, একদিন সেকণ্ড ক্লাস (ফ্যান নেই, ১ টাকা ২০ পয়সা ভাড়া, এক টাকা চার আনা দিয়ে চৌকোমতন পাঁচ পয়সা ফেরত নিতাম), আর তার পরের দিন ফার্স্ট ক্লাস (ফ্যান আছে, ১ টাকা ৩০ পয়সা ভাড়া, এক টাকা চার আনা আর আগের দিনের পাঁচ পয়সার ভাড়া দিতাম)। আর সময় না থাকলে বাস, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সরকারি বাস ছাড়তো, এম-ডি-টু আর এম-ডি-টু-বি, দুটোই বেহালা যেতো, কিন্তু টু যেতো শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে ঘুরে কালীঘাট ব্রিজ দিয়ে আর টু-বি রাসবিহারী এভেনিউতেই সোজা চেতলা ব্রিজ দিয়ে, আমি আদ্যন্ত কালীঘাটের ছেলে (কালীমন্দির, মহাশ্মশান, আর আদিগঙ্গার সন্ধিক্ষণে আমার বাড়ি, পেশায় অঙ্কবিদ না হলে কাপালিকও হতে পারতাম), তাই চেতলা ব্রিজগামী টু-বি বাসই নিতে হত; আমার বেহালাবাসী সহযাত্রী শ্রেয়ার্থর যে কোনো একটা বাস নিলেই হত, কিন্তু গল্প করার লোভ সামলাতে না পেরে টু-বি-র জন্যই অপেক্ষা করত, বাসের ওপর নম্বর লেখা থাকতো না, তাই প্রায়শই "টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দা কোশ্চেন" প্রশ্ন করে আমাদের দুজনকে বাসে উঠতে হত। কিন্তু

প্রিয়ক ভালো ছেলে, ভালো ছেলেদের মা-বাবারা স্কুল থেকে নিতে আসতো (যেমন রুদ্রজিতের বাবা, অনিন্দ্যর মা), তাই সে আমাদের মত বখাটেদের সাথে একা একা ফিরতো না, ওর এক খুড়তোতো না জ্যাঠতোতো দাদা নিয়ে যেতো। সময়ের অবিরাম গতিতে ভালো ছেলেরাও বড় হল, প্রিয়কেরও একা একা বাড়ি যাওয়ার দিন এল, প্রিয়কের দাদা তাকে সমর্পণ করল আমার হাতে। পরম দায়িত্ব সহকারে আমরা তুললাম ওকে এম-ডি-টু-বি বাসে; বাস তখন দেশপ্রিয় পার্ক ছেড়েছে, আমি চমকে প্রিয়কের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, "তুই বেহালায় থাকিস না ?" বেচারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ"। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "সে কী ? এই বাস তো রাসবিহারী মোড় হয়ে চেতলা ব্রিজ হয়ে নিউ আলিপুর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তুই তো বেহালা যাবি, তুই এই বাসে কী করছিস ?" (ধর্মাবতার লক্ষ্য রাখবেন, মিথ্যাচার করি নি।) প্রথমে ভাবল পেছনে লাগছি (রসিক হিসেবে স্কুলে আমার সুনাম ছিল), অবিশ্বাসের সুরে প্রিয়ক কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, এই বাসটা কি রাসবিহারী হয়ে যাবে ?" বাস তখন লেক মার্কেটে ঢুকছে,সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ হেন প্রশ্ন শুনে কণ্ডাক্টর রীতিমত বেঁকিয়ে উত্তর দিল, "না, তোমার বাড়ি হয়ে যাবে !" দাদাহীন প্রিয়কের সেদিন প্রথম একলা যাত্রা, মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে কী করবো ?" আমি একটা দায়িত্ববান বড় দাদার মত বললাম, "ভয় করিস না, রাসবিহারীতে নেমে যা, এখান থেকে বেহালার অটো পাওয়া যায়, নিয়ে নে।" শুনে আশ্বস্ত হয়ে নেমে গেল, আর প্রিয়কবিহীন এম-ডি-টু-বি বাস চলতে থাকল চেতলা ব্রিজ হয়ে নিউ আলিপুর দিয়ে বেহালায় প্রিয়কের বাড়ির উদ্দেশ্যে। মনে আছে, অনেকদিন পরে একবার যোধপুর পার্কে অভিষেক বসু ওরফে সায়নের বাড়িতে আমরা বেশ কিছু বন্ধু গেছিলাম, ফেরার সময়ে প্রিয়ককে বাসে তুলে দিতে হল, এস-ডি-এইটে তুলে দিলাম (যেটা বেহালা যায়), আর জানালাম, "এটা রাসবিহারী যাবে, আর সেখান থেকে তো তুই চিনিস।" ততদিনে প্রিয়ক রাসবিহারী-বেহালা অটোরুটকে আপন করে নিয়েছে, সানন্দে রাসবিহারীর মোড়ে নেমে অটো নিয়ে নিয়েছিল।

অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত কক্ষে আমাদের এই চারমূর্তির বন্ধুত্ব হল সৌম্য বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। সৌম্যর সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হল বিরোধিতার, মানে চলিত বাংলায় আমরা সৌম্যকে চাটতাম। এতে দায়িত্ববান পাঠকের ভ্রূকুঞ্চিত হবে, তিনি চোখ সরিয়ে নিয়ে বলবেন, র‍্যাগিং, বুলিইং, ইত্যাদি অকথ্য ঘৃণ্য নোংরামি তিনি সমর্থন করতে পারেন না। বয়সের সাথে বুঝেছি, আমিও সমর্থন করতে পারি নি, কিন্তু বিদেশী হলিউডের বুলিইং-এর মধ্যে যে এক ট্যারান্টিনোয়েস্ক ভায়োলেন্স আছে, স্বদেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের র‍্যাগিং-এর মধ্যে তেমনি যে এক অনুরাগ কশ্যপোচিত হিংস্রতা আছে, অষ্টম শ্রেণীতে সৌম্যকে চাটার মধ্যে সেটা একান্তই অনুপস্থিত ছিল, পাঠককে এটুকু আশ্বস্ত করতে পারি। সেসব দিনের পরে প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে, আজ ভালো করে ঠিক মনেও পড়ে না সৌম্য কী এমন অন্যায় করেছিল যে আমরা সম্মিলিত ভাবে তাকে চাটতে শুরু করেছিলাম। (আবার দু'দশক আগের কিছু কিছু স্মৃতি আজও প্রখর, যেমন ও হেনরি পড়ে সেই সৌম্যর সাথেই সপ্তম শ্রেণীতে চুক্তি করেছিলাম, কুড়ি বছর বাদে ১৫ অগস্ট দুপুর বারোটায় সাউথ পয়েন্টের বাইরে দেখা করবো, তিন বছর আগে সে চুক্তিভঙ্গ করেছি, তার জন্য আপসোস করি, শুধু ভরসা রাখি ২০১৬-র ১৫ অগস্ট দুপুর ১২-টায় সাউথ পয়েন্ট গেটের সামনে সৌম্য অপেক্ষা করছিল না।) বাকিদের মোটিভ আরোই মনে নেই, তবে সৌম্যর বিরোধীপক্ষে আমার নাম লেখানোর বোধ করি একটা কারণ ছিল যে সৌম্য ছিল বড়লোক। (মানে ঠিক মুকেশ আম্বানী নয়, আমরা কটি কচি বাঙালী শার্লকরা কেবলমাত্র এটুকু "অবসার্ভ" করেছিলাম যে শীতকালে আমরা যখন সোয়েটার পরি, সৌম্য তখন ব্লেজার পরে, আর সেটা থেকে বাকিটা "ডিড্যুস" করেছিলাম।) কৈশোরে আমরা তখন চূড়ান্ত শভিনিস্ট, মানে হিন্দু শভিনিস্ট, বাঙালী শভিনিস্ট, মিডল-ক্লাস শভিনিস্ট, এমনকি শভিনিস্ট শভিনিস্ট (মানে, যারা শভিনিস্ট নয়, তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতাম না)। মধ্যবয়সে এসে বুঝি, এসব কোনো শভিনিজমেরই কোনো মানে নেই। হিন্দু শভিনিজম বাঙালীরা জনসমক্ষে করে না, কিন্তু আজ বাঙালী শভিনিস্ট অনেককে দেখি, বাকি সব শভিনিজমের মতই এই শভিনিজমটিও অবান্তর। (মানে বাঙালী হয়ে জন্মেছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য, সঞ্চয়িতার কবিতা পড়তে পারি, গীতবিতানের গান শুনতে পারি, সারাজীবন পড়েও রবীন্দ্ররচনাবলী শেষ করতে পারবো না, কিন্তু এটা কোনোমতেই আমার গর্বের বিষয় হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি গর্ব করবো কেন, রবীন্দ্রনাথ কি আমার প্রপিতামহ ?) কিন্তু স্কুলজীবনে শভিনিজমের অসারতার এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝতাম না, আর মিডল-ক্লাস শভিনিজমের তীব্র আবেগে প্রাণপণে ব্লেজারপরিহিত সৌম্যর বিরোধিতা করতাম।

আমি পেছনে লাগতাম শুদ্ধ বাঙালী কায়দায়। মিল করে করে প্যারোডি লিখে সৌম্যকে উৎসর্গ করতাম। মনে আছে, "প্রশ্ন" কবিতাটি ব্যবহার করেছিলাম, প্যারোডির প্রথম পংক্তি সহজেই অনুমেয়, "ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে"।

পরের এক পংক্তিতে দেবদীপেরও উল্লেখ ছিল, "আমি যে দেখেছি মোর দেবদীপ উন্মাদ হয়ে ছুটে, কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে", সেদিন জোর করে মাত্রাবৃত্তে ছন্দ মিলিয়ে লিখেছিলাম, নিয়তির করুণ পরিহাসে আজ কেমনে সেটা সত্যি হয়ে গেল!

এসব কবিতা পড়ে সৌম্যও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, একবার ইংরিজিতে প্রিয়ক, সায়ন, দেবদীপ, আর আমার উদ্দেশ্যে একটা তিন পাতার কবিতা লিখেছিল, যার সারমর্ম ছিল, আমরা ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে সবাই বন্ধু হই না কেন? সেই প্রশ্ন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রথিবীর প্রতিটি কোণে স্তম্ভিত হাওয়ায় আজও ফিসফিস করে বাজে, কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সী আমাদের চার কচি ক্যাওড়ার কানে সেটা বড়ই মেকী আর ন্যাকা-ন্যাকা লেগেছিল। সৌম্যর মৈত্রীসূচক শান্তিবার্তায় ভুল খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত, কিন্তু আমাদের তখন শিরায় শিরায় নিন্দার রক্ত, আমাদের শ্যেনদৃষ্টি মুহূর্তান্তেই খুঁজে নিল সেই কবিতার একটিমাত্র দোষ, কলকাতায় বসে ইংরিজিতে কবিতা লিখেছে। লিখে ফেললাম তিন পাতার উত্তর, পুরোটা বলে পাঠককে বিরক্ত করবো না, শুরুটা বলছি

ছড়ার বদলে ছড়িটি তোমায় দিতে তো না পারি,
ছড়ি দিলে তুমি ছেড়ে তো দেবে না, হবে মারামারি।
দরকার নেই বুল ফাইটিং, মরে যদি যাই,
ছড়ার বদলে ছড়া বুমেরাং লিখে দিই তাই।
ইংরিজি লিখে বলেছো মেটাতে ঝগড়া বিবাদ
বাংলায় লিখে উত্তর দিই, সাধু প্রস্তাব।
বাংলায় কেন, প্রশ্নটা যদি করলে আমায়
উত্তর দেব, বেশ করি লিখি মাতৃভাষায়!

আর সেদিন থেকেই সৌম্য হয়ে গেল বাঙালীবিদ্বেষী!

সায়নের পেছনে লাগার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকমের। সায়ন লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যদের পেনসিল বাক্স থেকে পেন বার করে সৌম্যর পেনসিল বাক্সে লুকিয়ে রাখতো; অনতিবিলম্বে নিখোঁজ পেনের তল্লাসি হত, আর শেষে তা পাওয়া যেত সৌম্যর কাছে। এরকম করে প্রায় একমাসের মধ্যে সায়ন সৌম্যকে একজন পাকা ক্লেপ্টোম্যানিয়াকরূপে প্রতিপন্ন করেছিল। সায়নের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে অনেকদিন পরে প্রিয়ক (আর তারো ক'দিন পর থেকে শুভঙ্কর) একজনের টিফিন বার করে অন্যজনের টিফিনে ঢুকিয়ে দিত, এরকম অদলবদল করতে গিয়ে কয়েকজনের চমৎকার টিফিন হত, আবার কারুর কারুর টিফিন হত দেখবার মত (একবার অমিতাভ তার টিফিন খুলে দেখে একটা কলা আর দুটো রুটি; বাড়ি গিয়ে নিজের মায়ের কাছে ক্ষোভপ্রকাশ করে জানতে পেরেছিল যে সেদিন তার আসল টিফিন ছিল পোলাও)। আবার পরে কখনো হয়তো খুব শান্তভাবে ক্লাস চলছে, রীণাদেবী তিনফুট কাঠের কমপাস নিয়ে ইনসার্কেল আঁকছেন, সবাই মনোযোগসহকারে খাতায় সেটা টুকে নিচ্ছে, এমন সময়ে হঠাৎই সৌম্যর পশ্চাৎ-দেশ থেকে গগনভেদী গর্জন শোনা যায়, ছাত্রদলের কঠোর সংযমের বাঁধ তাতে ভেঙে পড়ে, গোটা ঘর ফেটে ওঠে অট্টহাসিতে। (সায়নের হাতে যাদু ছিল, আজও আছে, বাঁ হাতের চাটুর ওপর ডান হাতের তর্জনী মধ্যমা আর অনামিকার হালকা স্পর্শে নানাবিধ ধ্বনি উৎপন্ন করতে পারতো।) এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, সপ্তম শ্রেণী থেকে আমরা সব ছেলেরা আমাদের হাফ প্যান্টের ওপরে বেল্ট পরতে শুরু করেছিলাম, তারও মূল প্রেরণা ছিল সায়ন, না পরলে পেছন থেকে প্যান্ট টেনে নামিয়ে দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সৌম্যকে মোষ আখ্যানটা সায়নেরই প্রেরিত (উপরোক্ত "বুল ফাইটিং" শব্দদ্বয় সেই সূত্রেই লেখা)। সেই সময়ে "এনাকোণ্ডা" নামক একটি সিনেমা এসেছিল (আজ দেখতে গেলে অতীব হাস্যকর লাগবে, অনেকটা চাঁদের পাহাড় দ্বিতীয় খণ্ডের দেবের মতো হাস্যকর), সেটা দেখার পর থেকেই সায়ন সৌম্যর নাম দিল "এনাকোণ্ডা", আর সৌম্যকে দেখলেই চেঁচাতো, "এনাকোণ্ডা, হিরো হণ্ডা"। যে পাঠকের সায়নের সাথে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি, তারা হয়তো "এনাকোণ্ডা, হিরো হণ্ডা" এই ছড়াটির মধ্যে কবিত্ব বা সৌন্দর্য খুঁজে পাবেন না, তাদের প্রতি করুণা হয়, তবে তাদেরকে বলি কল্পনাশক্তি প্রখর করতে, ধরে নিন ঘনাদার মত চেহারা, আর টেনিদার মত গলা, আর সেই বাজখাঁই গলায় সায়নের এক অশ্রুতপূর্ব সুরেলা বাকভঙ্গী, সেই অননুকরণীয় কণ্ঠে সায়ন ডাকতো, "এনাকোণ্ডা, হিরো হণ্ডা"।

প্রিয়ক কোনো চাটাচাটি করতে পারতো না, কারণ আগেই বলেছি, প্রিয়ক অতি সুবোধ বালক। শুধু আমাদের বাকিদের চাটাচাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে উপভোগ করত। আর মাঝেমাঝেই অদম্য হাসিতে ফেটে পড়তো। সে হাসি আমাকে অনেকবার ফাসিয়েছে, একবার ইতিহাসে পারমিতা-আন্টির কাছে বকুনি খেয়েছি আমি, প্রিয়ক, আর চৌধুরি, কারণ বইতে "বক্সার

রেভলিউশান" কথাটা পড়ে প্রিয়ক হাসি থামাতে পারে নি, একবার রাবণ (আসল নাম রবীন্দ্রনাথ) পালের কাছে ঝাড় খেয়েছি আমি, প্রিয়ক, আর সোমদীপ, কারণ "ডটস এণ্ড বক্সেস" খেলার শুরুতে আমি প্রথমে একটা দাড়ি টেনেছি, সেই চৌকোতেই প্রিয়ক একটা দাড়ি টেনেছে, তারপর সেই চৌকোতেই সোমদীপ একটা তৃতীয় দাড়ি টেনেছে, এই অনন্যসাধারণ খেলা দেখেও প্রিয়ক উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়েছে। তবে প্রিয়ক মনোযোগী ছাত্র, সায়ন, দেবদীপ, আর আমার থেকে চাটাচাটিতে শিক্ষিত হয়ে অচিরেই প্রিয়ক তার গুরুদের ছাপিয়ে গেছিল। শেষের দিকে প্রিয়ক আর দেবদীপ মিলে এমন কিছু কাণ্ডও করেছে, যা দেখে আমি আর সায়ন পর্যন্ত পিছপা হয়েছি, তবে সেগুলি বলা বোধ করি সমীচীন হবে না। প্রিয়ক আজ দেশের দায়িত্ববান নাগরিক, নামী কম্পানিতে কর্মরত, সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করছে, তাই কী হবে সেসব দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে ? শুধু এটুকু বলতে পারি, গলায় জলের বোতল ঝুলিয়ে অমিতাভ সকালে স্কুলে এসেছিল, আর বিকেলে ডাক্তারবাবু তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এরকম বন্ধু জোগাড় করলে কোথা থেকে ?", আর দুঃখে আর রাগে সেদিন সন্ধ্যায় অমিতাভর মা ফোন করেছিলেন প্রিয়কের আর দেবদীপের বাবাকে, আর তার পরে প্রিয়ক টানা দু'তিন দিন ধরে বকুনি খেয়েছিল, তবে দেবদীপ কোনো বকুনি খায় নি, কারণ অমিতাভর মা যখন দেবদীপের বাড়িতে ফোন করে বললেন, "দেবদীপের বাবার সাথে কথা বলতে পারি ?", ফোন দেবদীপই ধরেছিল, একটু ভারী গলা করে উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ, বলছি।"

আর দেবদীপ, সেই দেবদীপ ! স্থিতিশীল বাঙালী জীবনে সে এক প্রবল প্রলয়কাণ্ড ! স্তম্ভিত বাতাসে সে এক দুরন্ত ঘূর্ণিঝড় ! গ্রীষ্মের দাবদাহে সে এক দমকা হাওয়ার কালবৈশাখী ! মৃদুমন্থর গঙ্গাবক্ষে সে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ! আপন ঘরের একান্ত নিভৃতে সে এক মাতাল হট্টগোল !

সৌম্যর ঘটনাচক্রে মিলে দেবদীপের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার আগে থেকেই তাকে অবাক নয়নে দেখেছি, আর যত দেখেছি, তত বুঝেছি, দেবদীপের বিশেষত্ব হল, আমাদের বাকিদের মগজে এমিগ্লাডা নামক যে ভীতিকেন্দ্র আছে, দেবদীপকে গড়ার সময়ে ভগবান সেটা দিতে বেমালুম ভুলে গেছিলেন। হেন দিন যেত না যেদিন দেবদীপ কিছু না কিছু কাণ্ড করতো। দেবদীপের সে বিবিধ প্রকৃতির দৈনিক কার্যকলাপের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখা হয়তো আমার উচিত ছিল (আর লিখে রাখার জন্য সঙ্গে সেই নীল রঙের বাঁধাই করা ডায়েরীও ছিল), কিন্তু ভুল হয়ে গেছে, সেসবের হিসেব রাখা হয় নি, কেবলমাত্র দেবদীপের শ্রেষ্ঠ কিছু ঘটনা যা মনের গভীরে দীর্ঘ রেখা কেটে গেছে, আজ সেগুলোর কথাই বলি। একদিন ইন্দ্রাণী-আন্টি একটা রঙচঙে সোয়েটার পরে ক্লাসে ঢুকেছেন, দেখেই দেবদীপ জোরে শিস দিয়েছে (শিস দেওয়াতে কলেজজীবনে নিশ্চয় অনেকেই পারদর্শী হয়েছে, কিন্তু স্কুলে আমাদের কচি শিশুদের কাছে ব্যাপারটা কল্পনাতীত ছিল), সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রিন্সিপাল-সাহেবের ঘরে, প্রখর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে সে সঙ্গে একটা ঢাকনাসমেত বলপয়েন্ট পেন নিয়ে নিয়েছে, আর প্রিন্সিপাল এ-এন-ব্যানার্জির সামনে কাঁচুমাচু মুখ করে বলেছে, "পেনের ঢাকনায় কালি ঢুকে গেছিল, ফুঁ দিয়ে বার করতে গেছিলাম, তাতেই সিটি হয়ে গেছে, এই দেখুন না স্যার, অনেকটা এরকম -", আর বলে প্রিন্সিপালের সামনেই পেনের ঢাকনায় ফুঁ দিয়ে দু'তিনবার শিস দিয়েছে। এটা পড়ে যে সকল পাঠক মুচকি হেসে ভাবছেন, হুঁঃ, এ-এন-ব্যানার্জি, তাতে আর কী এল গেল (বলা বাহুল্য, প্রিন্সিপাল ছিলেন নিতান্তই সরল সাধাসিধে বাঙালী ভদ্রলোক, শরীরে রাগের ছিটেফোটা ছিল না), হত যদি ভাইস-প্রিন্সিপাল জয়তী সলোমন, তবে বোঝা যেত, সেই সব পাঠকদের জ্ঞাতার্থে একটা ঘটনা বলি।

সেদিন আমাদের ফ্রি পিরিয়ড চলছে, মানে শিক্ষক বা শিক্ষিকা আসেন নি, আর শেষ মুহূর্তে সাব-ও পাওয়া যায় নি। ফ্রি পিরিয়ডে আমরা বেশীরভাগ সময়েই নিজেরা নিজেদের মধ্যে গল্প (বা পরনিন্দা পরচর্চা) করতাম, আর কালেভদ্রে সবাই মিলে অন্তাক্ষরী বা ক্যুইজ খেলতাম, ছাত্ররা তিনটে রো-তে বসতো, তাতেই তিনটে দল হত। অন্তাক্ষরী হলে আমাকে খেলতে দেওয়া হত না (অত্যন্ত যৌক্তিক এক সমবেত সিদ্ধান্ত), কিন্তু ক্যুইজ হলে আমাকে প্রায়শই ক্যুইজমাস্টার হতে হত - ছোটবেলা থেকে জেনে জেনে জানোয়ার হয়েছি, জ্যাক অফ অল ট্রেডস কিঙ অফ নান, এই দেখো আমি চৌকি টানিয়া, লাইব্রেরী হতে কিতাব আনিয়া, কত পড়ি লিখি বানিয়া বানিয়া শানিয়া শানিয়া ভাষা, সুতরাং ক্যুইজমাস্টার হিসেবে আমাকে ভালোই মানাতো। মনে আছে, একবার জিজ্ঞাসা করেছি, "নেম ফোর প্লেসেস ইন দ্য সোলার সিস্টেম হুইচ হ্যাভ লিক্যুইড ওয়াটার" (আমার ছোটবেলা থেকেই এস্ট্রোনমি নিয়ে খুব সখ, ইচ্ছে ছিল এস্ট্রনমার হব বা ক্যাপ্টেন হ্যাডক হব, কিন্তু অনেক অকালস্বপ্নের মতই এই দুটোও অধুরা রয়ে গেল), আমার উত্তর ভাবা ছিল, আর্থ, মার্স, য়্যুরোপা (জুপিটারের উপগ্রহ), এবং এন্সেলাডাস (স্যাটার্নের উপগ্রহ), প্রশ্ন করতে না করতেই দেবদীপ হাত তুলে উত্তর দিয়ে দিল, "ক্যালকাটা, বোম্বে, ম্যাড্রাস, দিল্লি", আর সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণবন্ত হাততালি। এরকমই একদিন ফ্রি পিরিয়ড হচ্ছে, আমি ক্যুইজ সঞ্চালনা করছি, কোনো এক প্রশ্নের উত্তরে মতভেদ-হেতু ঘরের সকলের মধ্যে একটু উচ্চৈস্বরে আলোচনা চলছে, পাশের করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন

ভাইস-প্রিন্সিপাল জয়তী সলোমন, আমাদের তারস্বরের চীৎকার-চেঁচামেচি শুনে থামলেন, আর দরজা খুলে প্রবেশ করলেন আমাদের কক্ষে। জয়তীদেবীকে আমরা (দেবদীপ ব্যতীত, অবশ্যই) যমের মত ভয় পেতাম, ভবিষ্যতজীবনে ওনার সাথে অনেক কথা হয়েছে, তখন বুঝেছি ছোটবেলার ভীতি নিতান্তই অযৌক্তিক ছিল, কিন্তু সপ্তম শ্রেণীর আমি সে নির্ভয়তার চিন্তাধারায় অবগত ছিলাম না, মিসেস সলোমনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই আমি ম্যালেরিয়ার রুগির মত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। আর সবাইকে সেই কম্পনমান অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখেই মিসেস সলোমন এক নিঃশ্বাসে টানা পাঁচ মিনিট আমাদের ইংরিজিতে চূড়ান্ত বকলেন। শরীর তখনো দু'শ বছরের ইংরেজশাসনের ভয়, অনর্গল অতটা ইংরিজি শুনে আমরা সবাই ব্যোমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। (আধুনিক প্রজন্ম শুনি নেটফ্লিক্স দেখে বড় হচ্ছে, তাদের এই দুর্দশা হত না।) জয়তীদেবী যখন থামলেন, ঘরের মেঝেতে পিন কি, একটা টুথপিক পড়লেও তার আওয়াজ শোনা যেত। তখন উঠিল ধীরেধীরে, রক্তভাল লাজনম্রশিরে, বাঁ হাতে একটা খাতা আর ডান হাতে একটা কলম নিয়ে, নোট নেওয়ার ভঙ্গীতে দেবদীপ করুণ সুরে মিনতি করলো, "এক্সকুয়েজ মি আন্টি, কুড য়্যু প্লিজ রিপিট দ্যাট ?" এবার জয়তী সলোমনের ব্যোমকে যাওয়ার পালা, নির্বাক মিসেস সলোমন সেদিন নিরুত্তরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিলেন।

সেই দেবদীপ যখন সৌম্যর পেছনে পড়ল, গল্পের পুরো ভোলই পালটে গেল। দেবদীপের প্রথম নজরই পড়ল সৌম্যর ব্লেজারের ওপরে। একদিন পিটি ক্লাসে সৌম্য যখন মন দিয়ে শরীরচর্চা করছে (দেবদীপ পিটি-যাতীয় ক্লাস করত না, দেবদীপ তখন মন দিয়ে বাঙ্ক করছে), পাশের ঘরে সৌম্যর ব্লেজারটা খোলা আছে, এমন সময়ে সহসা ব্লেজারটা ভ্যানিস হয়ে গেল ! (এই চমৎকার জাদু দেখলে অনতিদূরের ইন্দ্রজালের বাসিন্দারাও চমকিত হতেন।) দেবদীপের চারপাশে এরকম মাঝে মধ্যেই জিনিসপত্র লোপাট হওয়ার জাদু ঘটতো, একাদশ শ্রেণীতে দেবদীপ একবার ফিসিক্স ল্যাব করার পর ল্যাবের সমস্ত স্ক্রু-গেজ ভ্যানিস হয়ে গেছিল, পরে ছেলেদের বাথরুমের ট্যুব-লাইটের ওপর থেকে সেগুলো উদ্ধার হয়েছিল। আরো মজার, দ্বাদশ শ্রেণীতে দেবদীপ একবার কেমিস্ট্রি ল্যাব করার পর এক শিশি ফেনপথিলিন লোপাট হয়ে যায়, আর কোনোদিনই তা ফেরত পাওয়া যায় নি, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ল্যাব-এসিস্টেন্ট ঘরে ঢুকে দেখেছিলেন, ল্যাবের পেছনে যে সারি সারি সোডিয়াম-হাইড্রোক্সাইডের বোতল রাখা থাকত, তারা সবাই গোলাপী হয়ে গেছে। (বলা বাহুল্য, সে সব বোতলই জলে গেল, টাইট্রেশনে কোনো কাজে লাগলো না।) যাই হোক, ফেনপথিলিন ঘটনার প্রায় চার বছর আগে, সেদিন পিটি ক্লাসের পর সৌম্যর ব্লেজারের তুমুল তল্লাসী হল। প্রায় দশ-পনেরো মিনিট পরে, দেবদীপ "খুঁজে" পেল সেই ব্লেজার, উৎসাহিত চোখে ডান হাতে এগিয়ে দিল সৌম্যর কাছে, "এই যে পেয়েছি, তোর ব্লেজার", আর বামহস্তে বাড়িয়ে দিল, "আর এই যে তোর ব্লেজারের বোতামগুলো"। এতে কিছু পাঠক ভাববেন, এ কী, এ তো ডিসট্রাকশন অফ প্রপার্টি, এ তো ক্রাইম, তাদেরকে জানাই, দেবদীপ ঠিক আপনাদের উত্তম কুমারোচিত হিরো নয়, আবার তা বলে বিপ্লব দাশগুপ্তের মত ভিলেনও নয়, সাদা আর কালোর ছাড়াও অনেক রং আছে, আর তাদের কারুর কারুর রশ্মিচ্ছটার সুতীব্র ঔজ্জ্বল্য কোনো কোনো দিন সকল চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তবে দেবদীপবিরোধী সেই পাঠকেরা খুশি হবেন এটা জেনে যে সেদিন পিটি-স্যার বেল্ট খুলে দেবদীপকে বেধড়ক মেরেছিলেন। আজকাল শুনি স্কুলে মারধোর হয় না, নবপ্রজন্ম ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, জ্যোৎস্নার আলোয় তাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে, কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা প্রচুর মার খেয়েছে। রাবন পালের চড় খেয়ে চশমা খুলে যেতে দেখেছি, প্রহার-লাইনে পরবর্তী ছাত্র অনির্বাণ চশমা খুলে গাল বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকী সকল ছাত্রছাত্রীর সর্বপ্রিয় শিক্ষক, মল্লার রায়, তাঁকেও ছাত্রদের চড় মারতে দেখেছি, তবে বেল্ট দিয়ে মারা আমার (এবং যতদূর মনে হয়, আমাদের সকলের) সেদিনই প্রথম আর শেষ দেখা। দেবদীপ অবশ্য গায়ের আঘাত গায়ে মাখে নি, মারধোর সে তার আগেও জীবনে অনেকবার খেয়েছে, তার পরেও জীবনে অনেকবার খাবে।

একদিন সৌম্য জিওমেট্রি-বাক্স আনতে ভুলে গেছে, ক্লাসে রীণা-আন্টি জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন করাচ্ছেন, আর সৌম্য প্রাণপণে একটা কম্পাস খুঁজছে, এমন সময়ে হঠাৎই ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে দেবদীপ "এই নে, কম্পাস" বলে একটা কম্পাস ছুড়ে দিল, সময় যেন থমকে গেল, নিস্তব্ধ ঘরে নির্বাক আমরা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকলাম, আর পুরোটা বোধগম্য হওয়ার আগেই সৌম্য হাত বাড়িয়ে কম্পাসটাকে ক্যাচ করে নিল। সৌম্যর পরম সৌভাগ্য, ভগবানের অসীম কৃপা, আর নিউটনীয় মেকানিক্সের সম্মিলিত জোরে, সেই কম্পাস ধারালো দিকটা ওর হাতে পড়ল না, সেই যাত্রায় বেঁচে গেল। (অবশ্য, আমরা যারা চোখে চোখে প্যারাবলিক ট্র্যাজেক্টরিতে কম্পাসটাকে ধাওয়া করেছিলাম, আমাদের মনের ক্যানভাসে ছবিটা চিরতরে আঁকা রইল, এখনো চোখ বুঝলে দেখতে পাই, আর প্রতিবারই শিউরে শিউরে উঠি।)

শেষের সূত্রপাত হল সায়নের গাড়িতে। স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য সায়নের ড্রাইভার সমেত গাড়ি আসতো, ড্রাইভার ছিল গোবিন্দদা, আমরা ভালোবেসে সবাই তাকে গোবিন্দা বলে ডাকতাম। সবে সবে বসুশ্রীতে সবাই (গোবিন্দদা-সমেত) "বড়ে মিঁয়া, ছোটে মিঁয়া" দেখে এসেছি, তাই গোবিন্দা-অভিভাষণে গোবিন্দদা খুশিই হত। সায়নের গাড়িতে ঢাকুরিয়া, যোধপুর পার্ক, সেলিমপুর, যাদবপুর-নিবাসী অনেকেই ফিরতো, যেমন সন্দীপ, শান্তনু, দেবদীপ, ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমিও জুটে যেতাম, আর প্রিয়ক যতদিন আমার তত্ত্বাবধানে ছিল, প্রিয়ককেও বগলদাবা করে নিয়ে নিতাম। আমার আর প্রিয়কের বাড়ি ঐ পথে নয়, কিন্তু দুপুরবেলা আমাদের কিছু করার থাকতো না, চলে যেতাম সায়নের বাড়ি ক্রিকেট খেলতে। কম লোক থাকলে সায়নের ছাদে খেলা হত (য়ন ড্রপ য়ন হ্যাণ্ড), আর বেশি লোক হলে সামনের রাস্তায়, আমাদের ছেলেবেলায় যোধপুর পার্কের অলিগলি দুপুরবেলায় নির্জন থাকতো, ইঁট পেতে য়ুইকেট করে ক্রিকেট খেলতে কোনো অসুবিধা হত না। সায়নের বাড়িতে ক্রিকেট খেলতে গিয়েই আমার আম্পায়ার হিসেবে সুখ্যাতি হল - একদিন লাট্টু বল করছে, সায়ন ব্যাট করছে, আর আমি আম্পায়ার, লাট্টুর বল ইয়র্ক করে লেগস্টাম্পের ইঁট আর অফস্টাম্পের ইঁটের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাদের যেহেতু ইঁট পেতে খেলা, বোল্ডেও য়্যাপিল করতে হত, খুব নিশ্চিন্তে লাট্টু য়্যাপিল করল, কিন্তু লাট্টুর বল-এ কি আর আমি সায়নকে আউট দিতে পারি, খুব বিরক্তিসহকারে ঘাড় নেড়ে ওয়াইড দিলাম। ব্যাটিং-বোলিং কিছু করতে পারতাম না, কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ম্যাচে আমায় ডেকে নিয়ে যেত তাদের হয়ে আম্পায়ারিং করার জন্য, সেই সুখ্যাতি ভবিষ্যতে স্বদেশী কলেজে ও বিদেশী য়ুনিভার্সিটিতেও বজায় রেখেছি। (এহেন আম্পায়ারিং করে জীবনে অল্পবিস্তর ক্ষতিও হয়েছিল, দ্বাদশ শ্রেণীতে আমরা একটা ছাত্র-বনাম-শিক্ষক ম্যাচ খেলেছিলাম, মল্লার রায়ের খেলা দেখার জন্য ছাত্রীদের বিশাল ভিড় হয়েছিল, ওভার-দা-য়ুইকেট সুমন ভৌমিকের প্রথম বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়ে লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল, কেমন করে জানি না মল্লার-স্যার তাতে পা লাগালেন, আর কী ভেবে জানি না সুমন তাতে য়্যাপিল করলো, আর আমি নির্দ্বিধায় আঙুল তুলে দিলাম, মল্লার-স্যার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর সেদিন থেকেই সাউথ পয়েন্টের ছাত্রীসমাজে আমার চূড়ান্ত কুখ্যাতি।) এরকমই একদিন দুপুরে ক্রিকেট খেলার লোভে সায়নের গাড়ি করে স্কুলফেরত যোধপুর পার্ক যাচ্ছিলাম, গাড়িতে সামনে গোবিন্দা আর সায়ন, পেছনে আমি, দেবদীপ, আর প্রিয়ক। হঠাৎ দেখি সৌম্য সামনের গাড়িতে উঠলো, লোভ সামলাতে পারলাম না, গোবিন্দাকে বললাম, "গোবিন্দা, ঐ গাড়িটাকে ফলো করো", বেশ একটা জেমস বণ্ড জেমস বণ্ড ব্যাপার, গোবিন্দা সোৎসাহে পিছু করল। কর্ণফিল্ড রোডের পিলপিলে ছাত্ররাশির মধ্যে পরপর দুটো গাড়ি স্তিমিতগতিতে চলতে লাগল, আর কাঁচ নামিয়ে আমরা তারস্বরে সৌম্যর গাড়ির উদ্দেশ্যে চেঁচাতে থাকলাম - আমি "প্রশ্ন" কবিতার প্যারোডি আবৃত্তি করতে থাকলাম, "বালিগঞ্জ প্লেসে ফিরানু তোদের থুথু আর ধিক্কারে", দেবদীপ ঘোষণা করল, "এই সৌম্য, ধরে কেলাবো তোকে", সায়ন গান ধরল, "এনাকোণ্ডা, হিরো হণ্ডা", আর প্রিয়ক কেবল হো হো করে হাসতে থাকল।

গণ্ডগোল বুঝলাম পরদিন সকালে স্কুলে গিয়ে। সেদিন গাড়ি করে সৌম্যর মা নিতে এসেছিলেন, পুরো সময়টিই তিনি গাড়িতে ছিলেন, আমাদের ক্যাওড়ামি তিনি স্বকর্ণে সব শুনেছেন, আর পরদিন তার বিস্তারিত বিবরণ পৌঁছেছে ক্লাস-টিচার আর ভাইস-প্রিন্সিপালের কাছে। তলব হলো আমাদের চারজনের, শুনলাম আমরা নাকি গাড়ি থেকে সৌম্যকে শাসিয়েছি। শাসিয়েছিল মূলত দেবদীপ, আমি আর সায়ন কেবল কবিতা আওড়েছিলাম (মানে ওই আর কি), আর প্রিয়ক তো কিছুই করে নি, বেচারা সঙ্গদোষে ফেঁসে গেল। চারজনের বাড়িতেই ফোন গেল, তারপর গার্জেন-কল। পরের এক-দু সপ্তাহ বাড়িতে থমথমে পরিবেশ, শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে প্রিয়ক, সায়ন, আর দেবদীপকে ফিসফিস করে ফোন করে সান্ত্বনা জোটাতাম। দেবদীপ ছিল গার্জেন-কলের বিশেষজ্ঞ, মাসে একবার করে ওর গার্জেন-কল হতই, তাই এই ঘোর সঙ্কটে দেবদীপ আমাদের পথপরিচায়ক হল, ওর জীবনদর্শনে আমাদের দীক্ষিত করল। বললো, যা যখন ইচ্ছে হবে, তখুনি করবে; আমি বললাম, আর টিচার যদি বকে ? বললো, তাও করবে; আমি বললাম, যদি গার্জেন কল হয় ? বললো তাও করবে; আমি বললাম, যদি টি-সি হয় ? বললো, ধুস, টি-সি কখনো হয় নাকি, ছাত্রদের টি-সি করে দিলে স্কুলকে মাইনে দেবে কে ? আসলে ক্যাপিটালিজমের গভীর তত্ত্ব দেবদীপ আয়ত্ত করে নিয়েছিল, বুঝেছিল, স্কুলের আমরা হলাম পেয়িং কাস্টমার, আর কাস্টমার ইজ অলয়েজ রাইট! কম্যুনিস্ট বাংলায় বড় হয়ে আমি জাগতিক নিয়মে বড় হাঁদা ছিলাম, এই সহজ হিসেবটা সহজে বুঝতে পারি নি, তাই সারাজীবনই শিক্ষকদের সমীহ করে কাটালাম। (অবশ্য শিক্ষকতা করতে গিয়ে দেখি, য়ুনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা এই নিয়মটা খুব ভালো বোঝে, তাই আমার দিক থেকে এই হিসেবের খাতায় একটা বড় গোল্লা রয়ে গেল।)

দু-তিন মাস ধরে স্কুলে আর বাড়িতে অনেকবার বকাঝকার পর, সময়ের বিরামবিহীন গতিতে সব ঘটনার মত এই ঘটনারও

অবসান ঘটল। এই পর্বের সংক্রান্তির পর আমি, সায়ন, আর প্রিয়ক সৌম্যর থেকে দূরে দূরে থাকতাম, কেবল দেবদীপের অত্যাচার সৌম্যর ওপর ক্রমশ বাড়তে লাগল। মাঝেমধ্যেই সৌম্যর ব্যাগ থেকে বই বার করে তার পাতা ছিড়ত, একদিন স্ট্র্যাপ ধরে লম্বা করে ঘুরিয়ে নিজের ভারী জলের বোতল ডেস্কে রাখা সৌম্যর ব্যাগের ওপর গদাম করে মেরেছিল (এবং নির্ঘাৎ ব্যাগের ভিতরের সব সামগ্রী চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল)। পাঠক বুঝি এসব পড়ে সঙ্কুচিত হচ্ছেন, আসলে ব্যাপারটা কি, অন্য কেউ হলে হয়তো এসব কথা বলে আজ আর পাঠককে বিব্রত করতাম না (যেমন প্রিয়ক আর অমিতাভর গল্পটা বেমালুম চেপে গেলাম), কিন্তু দেবদীপের গল্প বলতে আজ আর কোনো বাঁধা নেই, সব শঙ্কিত পাঠকের সকল বিরক্তির ঊর্দ্ধে চলে গেছে সে।

এর কদিন বাদে সৌম্য স্কুল ছাড়ল, আমার জীবনের সৌম্য অধ্যায়ের সেখানেই ইতি। কিন্তু মাঝখান থেকে আমাদের চারজনের খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সায়ন আর প্রিয়কের সাথে বন্ধুত্ব আগে থেকেই ছিল, সেটা আরো দৃঢ় হল, কিন্তু সেদিন সৌম্যর মা আমাদের চারজনের নামে একসাথে নালিশ না করলে, দেবদীপের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়তো কোনোদিনও হত না, জীবনে একটা বড় অসম্পূর্ণতা রয়ে যেত (যা আমি টেরও পেতাম না)। সায়ন আর প্রিয়কের সাথে আমার আলাদা আলাদা বন্ধুবৃত্ত ছিল, সন্দীপ, শ্রেয়ার্থ, শান্তনু, রত্নদীপ, পলাশ, সায়ন (চ্যাটার্জি) এরা বিচরণ করত আমার আর সায়নের বন্ধুবৃত্তে। প্রিয়কের সাথে আমার বন্ধুবৃত্ত ছিল আরো বিস্তীর্ণ, আমাদের প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর কক্ষবদল হয়েছে, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে ছিলাম সংস্কৃত ঘরে, নবম-দশম শ্রেণীতে ছিলাম মেকানিক্স ঘরে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ছিলাম এক স্ট্যাটিস্টিক্স ঘরে, তাই সহছাত্রছাত্রী প্রচুর অদলবদল হয়েছে, কিন্তু এই পুরো ছ'বছরে আমার টানা সঙ্গী ছিল কেবল দু'জন, প্রিয়ক আর অনির্বাণ, তাই প্রিয়কের আর আমার বিভিন্ন শ্রেণীতে অনেক অনেক বন্ধু হয়েছিল, যেমন চৌধুরী, মৈনাক, রাহুল, রঞ্জন, অমিতাভ, শুভঙ্কর, শ্বেতপ্রভ, সুমন, সৌরভ, দেবজিৎ, দ্বৈপায়ন। (অনির্বাণের সাথে আবার আলাদা সম্পর্ক, আমাদের সময়ে ফুটবলে স্কুলে সবাই সমর্থন করতো ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনাকে, আর নিয়মভাঙা ব্যতিক্রমী আমরা ক'জন, আমি, চৌধুরী, অনির্বাণ, রত্নদীপ, বাপ্পাদিত্য, আমরা ছিলাম জার্মানির সমর্থক, তাই প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর এদের সাথে বন্ধুত্বের জোয়ার আসে, বহুদিন বাদে বছর পাঁচেক আগে এদের সবার সাথে ফেসবুকে খুব আনন্দোৎসব হল!) কিন্তু দেবদীপের আর আমার যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম, তাতে বাকিরা কেউই স্থান পায় নি, তাতে শুধু সায়নের আর প্রিয়কের প্রবেশাধিকার ছিল।

দেবদীপ এই গল্পের মুখ্য চরিত্র, কিন্তু পাঠককে এবার সাবধান করে দেওয়ার সময় এসেছে, দেবদীপ কোনো প্রকারেই এই গল্পের হিরো নয়। আসলে নায়কোচিত কোনো কাজ দেবদীপ কোনোদিনই করে নি। সারাক্ষণই সে মারপিট করে বেড়াতো, কারুর ওপর রাগ হলেই তাদের সাথে ঘুষোঘুষি করে আসতো, এবং কোনোরকম বাড়িয়ে বলছি না, মারামারি করতো ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। মাধ্যমিকের পরে বাইরের স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের একটা দল সাউথ পয়েন্টে আসত, তাদের মধ্যে একজন ছিল অনীতা ভেঙ্কটেশ্বরণ। এসেই সে স্থান করে নিল র‍্যাঙ্কারদের শিখরে, রুদ্রজিৎ, অনিন্দ্য, কৌশিকদের হেলাফেলায় সরিয়ে। এক অবাঙালী বহিরাগতা আমাদের এরকম নাস্তানাবুদ করল, তাতে আমাদের বাঙালী পয়ন্টার পৌরুষত্বে ভারী আঘাত লাগল। ঝামাঘষা মুখে রথীমহারথী র‍্যাঙ্কারদের মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা অনুমান করার স্পর্ধা রাখি না, শুধু এটুকু মনে আছে অনীতা ভেঙ্কটেশ্বরণের আড়ালে তার নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল ভণিতা। আমি তথাকথিত র‍্যাঙ্কার নই (যদিও পথ ভুলে একদু'বার প্রথম হয়ে গেছিলাম), তবুও এতদিন বাদে লজ্জাসহকারে হলেও স্বীকার করি, একটু গায়ে লেগেছিল। কিন্তু দেবদীপ তা মেনে নেবে কেন? দ্বাদশ শ্রেণীতে অনীতা যেদিন প্রথম হল, তার পরের দিনই দেবদীপ চলে গেল অনীতার কাছে, আর নির্লিপ্ত মুখে সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, "তোর মুখ দেখলে আমার হাগা পায়।" কী মুখের ভাষা, কী চূড়ান্ত অভদ্রতা! তবে কি, বাকি সভ্য ভদ্র পয়ন্টারদের মত আড়ালে ভণিতা করে নি। তবুও এই ঘৃণ্য অশ্লীলতায় কখনোই দেবদীপকে সমর্থন করা যায় না, এবং এই অকথ্য নোংরামো আমি কখনোই দেবদীপকে করতে বলি নি। কিন্তু পাঠককে এটাই বুঝতে হবে, দেবদীপকে আমি বলবার কে? দেবদীপকে কোনোকালেই কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি, সে আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু আমার বাকি বন্ধুদের সাথে যেমন আমি কিছু পথ একসাথে হেঁটেছি, দেবদীপের সাথে সেটা কোনোদিনই হয় নি, আমার জীবনবৃত্তে এক উজ্জ্বল স্বর্শক হয়ে চলে গেছে সে। আসলে দেবদীপ ছিল এক বিরামহীন অদম্য আদিম শক্তি। সে ছিল এক আদ্যন্ত গুণ্ডা, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য, সে ছিল আমার গুণ্ডা!

দেবদীপ প্রচুর মার খেত। মনে আছে, একদিন দেবদীপ ক্লাসে ঢুকছে, মাথার চুল রক্তে লাল হয়ে গেছে, হাত দিলে ছ্যাপছ্যাপ করছে, ঝুলপির কাছে রক্ত জমে চুলে জট হয়ে গেছে। জানলাম, গতকাল পাশের পাড়ার তিনটে গুণ্ডার বিরুদ্ধে দেবদীপ একাই মারপিট করতে গেছিল, আজ স্কুলে আসার সময়ে তারা দেবদীপকে ঘিরে লোহার চেন দিয়ে মেরেছে, একটা ঘা মাথাতেও লেগেছে, সেখান থেকেই রক্তারক্তি। বাড়ি ফিরে বলেছিল ঢাকুরিয়ায় রেল লাইন ক্রস করছিল, তখনই লেভেল

ক্রশিঙের বার-টা নেমে ওর মাথায় লেগেছে, তাতেই এই দশা! মারপিট দেবদীপ নিজের পাড়ার ছেলেদের সাথেও করত, ওর কাছেই ওর ছেলেবেলার একটা গল্প শুনেছিলাম। তখন দেবদীপের বয়স দশও হয় নি, দূর্গাপুজোর ছুটি পড়ে গেছে, দেবদীপ তার কিছু বন্ধুদের সাথে পাড়ার গলিতে ক্রিকেট খেলছে। রাস্তায় তখন বাঁশ পুঁতে পুজোর লাইটিং বসানো হচ্ছে, তাই পাড়ার হোমরা-চোমরারা এসে ওদের খেলা বন্ধ করে দিল, বাকি বাচ্ছারা ল্যাজ গুটিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু দেবদীপ ব্যাট নিয়ে সটান গেল পুজোর প্যাণ্ডেলে, তখন প্রতিমা এসে গেছে, গিয়েই ব্যাট ঘোরালো সোজা দেবীদূর্গার মুখের ওপর। ভাগ্যিস দেবদীপ তখনো লম্বা হয় নি, ব্যাটটা ঠাকুরের মুখ অবধি পৌঁছলো না, কেবল নাক অবধি পৌঁছলো, শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য লগ্নে দেবী তাঁর নাক খোয়ালেন। (বলা বাহুল্য, তার পরে বিশাল গণ্ডগোল হয়েছিল, ওদের প্রায় পাড়া ছাড়তে হয়েছিল, শৈশবের অজুহাতে দেবদীপ সেদিন প্রাণে বেঁচে গেছিল!) শুরুতেই বলেছি, আবারও বলছি, দেবদীপের শরীরে কোনো ভয়ডর ছিল না। আসলে ব্যাপারটা কি, সাত কোটি সন্তানদের সবাইকে মুগ্ধা জননী বাঙালী করে রাখেন নি, একজন-দুজনকে মানুষও করেছিলেন।

স্কুলের টিচারেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না দেবদীপকে কী করে সামলাবেন। বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে দেবদীপের বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ছিল। কেউ কেউ দেবদীপকে দেবদীপরূপেই মেনে নিয়েছিলেন, ওকে শোধরাবার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা করেন নি, তাদের সাথে দেবদীপের বেশ ভালো বনতো। দেবদীপের প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাই ক্লাসে প্রায়শই চটজলদি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতো, সেটাও পছন্দের বিশেষ একটা কারণ হতে পারে। পাঠক আশ্চর্য হতে পারেন এই ভেবে যে এই চূড়ান্ত গুণ্ডা দেবদীপ কী করে বুদ্ধিদীপ্তও হতে পারে, দু'একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। দেবদীপ চিরকালই লেখাপড়ায় ভালো ছাত্র ছিল, বিনা লেখাপড়াতেও স্কুলে মাঝেমধ্যেই র‍্যাঙ্ক পেত (তবে প্রত্যেক পরীক্ষার ঠিক আগের দিন নিয়ম মেনে আমায় ফোন করে সিলেবাস জানতো, আর এক রাতের সিলেবাসের ভরসাতেই দেবদীপ একের পর এক পরীক্ষা উৎরোতো)। সেরকম পদ্ধতিতে লেখাপড়া করেই স্কুলের পরে জয়েন্ট পরীক্ষাও উৎরে গেছিল, সোজা যাদবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অবধি, সেটা চাট্টাখানি কথা নয়। দেবদীপ মাধ্যমিকে আর উচ্চ মাধ্যমিকেও ভালো ফল করেছিল, তবে গতানুগতিক পন্থায় নয়, তাতেও দেবদীপোচিত অভিনবত্ব ছিল। আমাদের বেলায় বাংলায় রচনা এসেছিল, "পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও বিশ্বশান্তি", বিশ্বশান্তি নিয়ে তো রচনা তৈরিই ছিল, তাতেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঢুকিয়ে একটা গরুর রচনা লিখে এসেছিলাম। কিন্তু দেবদীপ এসবের চিরাচরিত প্রথার ধার ধারে নি, নিজের রচনায় একটা সুন্দর করে মাশরুম ক্লাউডের ছবি এঁকে এসেছিল, এবং বলা বাহুল্য, বাংলায় আমার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছিল। আর শুধু ভালো নম্বর পেয়েছিল তা নয়, পরীক্ষার পরে বলেও দিয়েছিল কোন বিষয়ে কত নম্বর পাবে (শুধু নিজেরটা না, আমারটাও), আর দু-তিন নম্বর এপাশ-ওপাশের মধ্যে সেগুলো মিলেও গেছিল।

আমরা মুখিয়ে বসে থাকতাম দেবদীপ ক্লাসে কখন চালাক চালাক কোনো মন্তব্য করবে। যেসব শিক্ষকেরা দেবদীপের ফ্যান ছিলেন, তাঁরাও বোধ করি দেবদীপের অপেক্ষায় থাকতেন, দেবদীপ ক্লাসে হাত তুললেই তাঁদের মুখ চোখ পুলকিত হয়ে উঠতো। মনে আছে, ইতিহাসের পারমিতা আন্টি ক্লাসে কালাপানি বোঝাচ্ছেন, সমুদ্রযাত্রা করলে নাকি ব্রাহ্মণদের জাত যেত, সেটা শুনে দেবদীপ ভট্টাচার্য জানাল, "দ্যাট ইস নট এন ইস্যু এনিমোর"। পারমিতা আন্টির মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল, তিনি উত্তর দিলেন, "ইয়েস ইণ্ডিড, থ্যাঙ্কফুলি, উই, এজ এ সোস্যাটি হ্যাভ গ্রোন পাস্ট সাচ সুপারস্টিশনস"। দেবদীপ তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "নো, আই মেন্ট, নাউ দে ক্যান ফ্লাই।" আবার একদিন ইংরিজি ক্লাসে একটা খুব মজার হোমওয়ার্ক ছিল, একটা বাক্য বলা আছে, "আই হার্ড ফুটস্টেপস আউটসাইড", সেটা প্রথম বাক্য করে একটা গল্প লিখে আনতে হবে। ক্লাসের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ভূতের গল্প লিখল, তবে আমি বরোদাপক্ষী নই, ব্যোমকেশপক্ষী, আমি গোয়েন্দাগল্প লিখলাম (মানে সত্যান্বেষণকাহিনী), আমি ওয়াটসন, সামনে হোমস বসে আছে, বাইরে যার পদধ্বনি শুনলাম, তিনি নতুন মক্কেল, হোমস পায়ের আওয়াজ শুনেই তার ব্যাপারে আমাকে অনেক কিছু জানিয়ে দিল, ইত্যাদি। দেবদীপ গল্প লিখল সম্পূর্ণ অন্য! সবাই হোমওয়ার্ক করে আনার পরে, ঠিক হল ক্লাসে একজন নিজের গল্পটা পড়ে শোনাবে, অনেকেই হাত তুলল, আমিও তুললাম (আমার গল্পে ট্যুইস্ট ছিল, আমি ওয়াটসনই খুন করেছি, খুব একটা অরিজিনাল নয়, তবুও শোনানোর ইচ্ছে ছিল), কিন্তু দেবদীপ যেই হাত তুলল, তৎক্ষণাৎ দেবদীপকেই চয়ন করা হল বক্তারূপে। হাতে খাতা নিয়ে নিরুত্তাপ দেবদীপ পড়তে শুরু করল, দেবদীপ একা কক্ষে বিরহী, বাইরের পদধ্বনি তার প্রেয়সীর, সে প্রবেশ করল ঘরে, পরণে মসৃণ সিল্কের ফিনফিনে সাদা শাড়ি, সামনের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দায় তারা দু'জনে দিয়ে দাড়ালো, শারদসন্ধ্যার মৃদু হাওয়ায় তার চুল চলে এসেছে তার মুখের ওপর, দেবদীপ হাত দিয়ে তা সরালো -- ব্যাস এখানেই থামি, আর বলে পাঠককে বিব্রত করবো না, তিনি নিজগুণে বাকিটা অনুমান করে নেবেন আশা রাখি। এদিকে আমরা একে ওপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি, রাজশ্রী আন্টির দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর কপালে রীতিমত বিন্দু বিন্দু ঘাম, এদিকে ইংরিজিটাও লিখেছে চমৎকার, কেউ কিছু বলতেও পারছে না, আর

পুরোটা শোনবার ইচ্ছেও সকলের প্রবল, সে এক বিড়ম্বনা আর অত্যাগ্রহের টানাপোড়েনে আমাদের সবার নাজেহাল অবস্থা। ক্লাসশেষের ঘন্টায় শেষে আন্টির মুক্তি হল (তখন গল্প সবে মাঝামাঝি, মুক্ত বাতায়নের হাওয়া ঘরের মশারিতে ঢেউ খেলাচ্ছে)।

কেবল ক্লাসে নয়, স্কুলের পরীক্ষাতেও দেবদীপ অভিনব উত্তর দিত। আমাদের স্কুল কেবল হাফ ইয়ার্লি আর এন্যুয়াল পরীক্ষার আয়োজন করেই ক্ষান্ত হত না, এন্যুয়ালের আগে একটা প্রি-এন্যুয়াল, আর হাফ-ইয়ার্লির আগে একটা ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষারও বন্দ্যোবস্ত করেছিল। তবে অনেকেই সে পরীক্ষাগুলোকে পাত্তা দিত না, দেবদীপও দিত না (আমি বিশেষ করে জানি, কারণ পরীক্ষার আগের রাতে ফোন করে আমার থেকে সিলেবাস জানত না), আর কিছু বিশেষ ছাত্রমহলে এই দুটো অতিরিক্ত পরীক্ষাদ্বয় ছিল একটা ফাজলামির প্রতিযোগিতা। যেমন দ্বাদশ শ্রেণীতে আমাদের "পূর্বরাগ" কবিতা পড়তে হয়েছে, পরীক্ষায় পূর্বরাগের মানে জানতে চাওয়া হয়েছে, তখন ৯/১১-র পরে আমেরিকা সবে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু করেছে, তাই উত্তরে শুভঙ্কর লিখেছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানের ওপরে বোমাবর্ষণের পরে পূর্বের লোকেদের পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে যে রাগ হয়েছিল, তাকেই বলে পূর্বরাগ।" সেরকম দেবদীপও একবার লিখেছিল, "মহেশ" গল্পে জানতে চাওয়া হয়েছে মহেশের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী, দেবদীপ চেনা প্রশ্নের চেনা উত্তরই লিখেছে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে গফুর দায়ী, পরোক্ষভাবে জমিদার দায়ী, কিন্তু গভীর বিচার করলে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা দায়ী, কিন্তু শেষে একটা বাক্য দেবদীপ নিজে থেকে সংযোজন করেছে, "কিন্তু সর্বোপরি সবার ওপরে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দায়ী।"

এদিকে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকারা দেবদীপকে অসাধারণ থেকে সাধারণে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন, দেবদীপও তাঁদের সুযোগ বুঝে যথাযথ উত্তর দিত। সেসব ক্লাসের জন্য দেবদীপ একটা নতুন খেলা আবিষ্কার করেছিল, ক্লাচ চলাকালীন চক ভেঙে ফ্যানে ছুড়তো, আর ফ্যানে লেগে ঠিকরে বিকট আওয়াজ সহকারে সে চকগুলি ছড়িয়ে পড়ত ঘরের কোণায় কোণায় (অনেকটা রাদারফোর্ড সাহেবের স্ক্যাটারিঙের মতন, আর কি), শিক্ষকেরা এ আচরণে মোটেই উৎফুল্লিত হতেন না, কিন্তু রাগত কণ্ঠে যতবারই দোষীর নাম জানতে চাইতেন, আমরা ছাত্রগণ ঐক্যবদ্ধ রইতাম, দেবদীপের নাম মুখ ফুটে কেউ বলতো না। (এই ফ্যানে চক ছোড়ার খেলা পরে খুব প্রচলিত হয়েছিল, দেবদীপের অবর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে আমাদের ঘরে শুভঙ্কর এর উদ্যোক্তা হয়েছিল, আজ দেবদীপ নেই, কিন্তু হয়তো সাউথ পয়েন্টের আনাচে কানাচে ফ্যানে চক ছোড়ার ট্র্যাডিশন আজো সমানে চলিতেছে।)

এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ে। স্ট্যাটিস্টিক্সের পারমিতা আন্টি ঠিক করলেন তিনি দেবদীপকে মানুষ করবেন। (পাঠক আশা করি গুলিয়ে ফেলবেন না, ইনি ইতিহাসের পারমিতা আন্টি নয়, তিনি ছিলেন দেবদীপের ফ্যান।) ক্লাসে প্রায় প্রতিদিনই বকাঝকা করতেন, মনে আছে একদিন বলেছিলেন, "ইফ য়্যু কন্টিনিউ লাইক দিস, য়্যুয়োর ফিউচার ইস ভেরি ব্লীক" (তবে নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন নি, আজ এমন করে সে ভবিষ্যৎবাণী ফলে যাবে)। শেষে দেবদীপে বিরক্ত হয়ে ঠিক করল এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। তার পরের দিন একটা লম্বা প্রেমপত্র লিখে সমর্পণ করলো পারমিতাদেবীকে, যার সারমর্ম ছিল, দেবদীপ অন্তর থেকে পারমিতা আন্টিকে ভালোবাসে, কিন্তু সে বোঝে সমাজ তাদের প্রেম মেনে নেবে না, তাই সে তার সুপ্ত প্রেম গুপ্ত রাখবে, কেহ জানিবে না তার গভীর প্রণয় ইত্যাদি, কিন্তু এর পরে যদি ক্লাসে পারমিতা আন্টি দেবদীপকে একটা কিছুও বলেন, তাহলে সে বুঝে যাবে যে তিনি দেবদীপের প্রেম স্বীকার করছেন, আর তাহলে দেবদীপকে সমাজকে আর তোয়াক্কা করবে না, বাকি সকলকে তাচ্ছিল্য করেই সে নিজহস্তে গ্রন্থন করবে তাদের প্রেমকাহিনী। এই চিঠি পাওয়ার পরে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণেই পারমিতা আন্টি আর দেবদীপকে ঘাঁটান নি।

একাদশ শ্রেণী চলাকালীন দেবদীপের কক্ষবদল হয়, যা সচরাচর হয় না। আমাদের সময়ের অন্যতম প্রখ্যাত বাংলা অধ্যাপক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ পাল। সেই রবীন্দ্রনাথ ওরফে রাবণ পালকে আমরা যমের মতন ভয় পেতাম। ছ ফুট ছ ইঞ্চির ধরাশায়ী চেহারা, মাথাজোড়া টাক, যতদূর মনে পড়ে, ভ্রূযুগলও চুলবিহীন, তার তলায় সুতীব্র চক্ষুদ্বয়ের প্রখর দৃষ্টি, যেন চোখের আলোয় ভস্ম করেছি চোখের বাহিরে, পরণে সবসময়ে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী, অনেকটা যেন কলিযুগের কলিকাতায় সত্যযুগের বঙ্কিমচন্দ্রের নতুন অবতার, গমগমে আওয়াজে ক্লাসে যখন মেঘনাদবধকাব্য থেকে "রাবণের রণসজ্জা" পড়াতেন, সব বেঞ্চের সব ছাত্র ব্যোমকে বসে থাকতো, বাল্মিকীর দশমস্তকধারী রাবণকে আমরা সাউথ পয়েন্টের রাবণ পাল রূপেই কল্পনা করতাম (আর আড়ালে "রাবণের রণসজ্জা"কে "রাবণের ফুলসজ্জা" বলে মস্করা করতাম)। সপ্তাহের পাঁচ দিনই রাবণ পালকে টিফিন পিরিয়ডের ঠিক পরের ক্লাসটা পড়াতে দেওয়া হত, স্টাফরুম থেকে ক্লাসরুম অবধি করিডর দিয়ে হেঁটে গেলে

আশেপাশের সব ক্লাস চুপ করে যেত, টিফিনের হৈহুল্লোড়ের অবসান ঘটত, সেটাই উদ্দেশ্য ছিল বোধ করি। একদিন টিফিনশেষের ঘন্টার মিনিট দশেক পর দেবদীপ ক্লাসে ঢুকছে, রবীন্দ্রনাথবাবু দেবদীপকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে প্রশ্ন করলেন, "মহাশয় সবে উপস্থিত হলেন ? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?" বাকি সব চ্যাংড়া ছেলেদের মতনই দেবদীপ তার প্যান্টের পেছনের পকেটে একটা চিরুনি রাখতো, মুহূর্তের মধ্যে সেই চিরুনি বার করে রাবণ পালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "আপনার জন্য চিরুনি আনতে গেছিলাম স্যার"। রবীন্দ্রনাথ পাল সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ক্লাস টিচার শুভাশিস স্যারকে বলেছিলেন, যতদিন দেবদীপ ঐ সেকশনে থাকবে, ততদিন উনি ঐ সেকশনে পড়াবেন না। তার পরেই দেবদীপের সেকশনচেঞ্জ হল, শুভাশিসবাবুর ঘর থেকে পার্থপ্রতিমবাবুর ঘরে।

দেবদীপের এই বিবিধ কীর্তিকলাপে সায়ন, প্রিয়ক, আর আমি বিশেষভাবে মজা পেতাম। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে যখন একসঙ্গে আর পড়ি না, তখন প্রায় প্রতিদিনই স্কুলের পরে চুটিয়ে দেবদীপের সাথে গল্প করতাম, দেবদীপ বিশদ বিবরণ দিত সেদিন সে কী কী কাণ্ড করে এসেছে। সকালের সব ছাত্র বাড়ি চলে যেত, দুপুরের সব ছাত্র স্কুলে ঢুকে যেত, দুপুরের কাঠফাটা রোদে স্কুলের শূন্য প্রাঙ্গণ তেতে উঠত, তবুও আমাদের গল্প শেষ হত না, শেষে দারোয়ানরা ঠেলাঠেলি করে আমাদের বার করতো। এরকমই একদিন দেবদীপ আর প্রিয়ক গল্প করছিল, তখন প্রিয়ক স্কুলবাসে করে বাড়ি যেত (আমি প্রিয়ককে কীরকম যত্নসহকারে বাড়ি পৌঁছে দিতাম, তার বর্ণনা প্রিয়কের দাদার কর্ণগোচর হওয়ার পরে, প্রিয়কের বাড়ি থেকে প্রিয়কের জন্য স্কুলবাসের বন্দ্যোবস্ত করা হয়), প্রিয়কের স্কুলবাস এসে গেছে, এদিকে দেবদীপের তখনো গল্প শেষ হয় নি, আর সেদিন আমি আর সায়নও ছিলাম না, তাই প্রিয়ক বাসে ওঠার পরও দেবদীপ গল্প বলে যেতে লাগলো, বাস সাউথ পয়েন্ট ছেড়ে কর্ণফিল্ড রোড ধরে প্রায় বালিগঞ্জ মোড়ে পৌঁছনোর পরে কণ্ডাক্টর খেয়াল করেছিল প্রিয়কের জানলার বাইরে গ্রিল ধরে দেবদীপ ঝুলতে ঝুলতে গল্প করছে! (এটা পড়ে পাঠক ভাবতেই পারেন আমি ডাহা মিথ্যে বলছি, আমি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখি নি, কিন্তু বহু লোকের থেকে শুনেছি, আর দেবদীপকে আমি যা চিনেছিলাম, তাতে এ ঘটনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য; প্রিয়ক আজ মধ্যবয়সে পৌঁছেও মিথ্যে বলতে শেখে নি, পাঠক চাইলে প্রিয়কের থেকে এ ঘটনার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন।)

স্কুলে গল্প শেষ না হলে বাড়িতে গল্প চালিয়ে যেতাম। ফোন তো ছিলই, একে ওপরের বাড়ি যাওয়াও চলতো তার সমান্তরালে। বিভিন্ন বন্ধুদের বাড়িতে বিভিন্ন রকমের মজা হত। যোধপুর পার্কে সায়নের বাড়ি গিয়ে আমরা মূলত ক্রিকেট খেলতাম। আবার সায়নের প্রতিবেশী সন্দীপের বাড়িতে শুধু নাটক নিয়ে আলোচনা হত, সন্দীপের একটা এমেচার নাটকের দল ছিল, "হুজুগে", তারা পরের কী নাটক করবে, কোন স্টেজে করবে, আর নাটক ঠিক হয়ে গেলে সন্দীপের ছাদে উঠে সেই নাটকের রিহার্সাল; আমি হুজুগে ছিলাম না, কিন্তু সন্দীপের সাথে হুজুগব্যতীত অনেক নাটক করেছি, আর হুজুগেদের অনেক রিহার্সাল দেখেছি। অনতিদূরেই সেলিমপুরে শান্তনুর বাড়িতে গেলে টিভি দেখা হত, আমাদের দুষ্টুমির অন্ত ছিল না, একদিন শান্তনুর বাড়িতে স্কেচ পেন দিয়ে টিভিস্ক্রিনের ওপরে টিভির চরিত্রদের এঁকেছিলাম। পাশেই যাদবপুরে দেবদীপের বাড়িতে আমরা প্রচুর কম্প্যুটার করেছি (মানে কম্প্যুটার গেম খেলেছি), আমাদের ছেলেবেলায় কম্প্যুটার লোকেদের বাড়িতে বাড়িতে ছিল না, তাই দেবদীপের বাড়িতে গিয়ে কম্প্যুটার করার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল; দেবদীপের কম্প্যুটারজ্ঞান প্রখর ছিল, বিভিন্ন ডি-এল-এল ফাইল নিয়ে কাটাছেঁড়া করতো, মনে আছে একবার য়্যুইণ্ডোস ৯৫-এর ডেস্কটপ থেকে রিসাইকেল বিন উড়িয়ে দিয়েছিল (য়্যুইণ্ডোস ৯৫ পৃথিবীর কোনো কোণে কোথাও পড়ে থাকলে, পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন, এ এক অতি দুঃসাধ্য কাজ)। প্রিয়কের বাড়ি ছিল বেহালা চোদ্দ নম্বরে - মোড়ের নাম চোদ্দ নম্বর কারণ মোড়ের মাথাতেই ছিল চোদ্দ নম্বর বাসের ডিপো, (সেটা নিয়েও একটা গল্প আছে, প্রিয়ক একদিন চোদ্দ নম্বর বাসে উঠে কণ্ডাক্টরকে প্রশ্ন করেছিল, "দাদা, এটা চোদ্দ নম্বরে যাবে ?") প্রিয়কের বাড়িতে গিয়ে আমরা সবাই কেবল প্রিয়ককে চাটতাম, তবে চাটার বিষয় খুব স্পর্শকাতর, সেটা এখানে বিস্তারিত বলা যাবে না। শ্রেয়ার্থও বেহালায় থাকত, বনমালী নস্কর লেনে (ঘনাদার বাড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে), ওর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে অনেক গল্প হত, পরে চলে গেছিল যাদবপুর হাসপাতালের কোয়ার্টারে, সেখানে বাইরে মাঠ ছিল (কলকাতার বুকে এক দুর্লভ বস্তু), বিকেলে মাঠে ক্রিকেট খেলে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে গল্প করতাম। একদিন শ্রেয়ার্থর যাদবপুরের বাড়িতে গেছি আমি, সায়ন, প্রিয়ক, আর দেবদীপ; সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সেই দুপুর থেকে টানা আড্ডা মারছি, তাই গল্পের রসদ প্রায় ফুরিয়ে গেছে, এদিকে বাড়ি ফেরারও কারুর ইচ্ছে নেই, তাই ঠিক হল আমরা গদাযুদ্ধ খেলবো। অর্থাৎ, সবাই একটা করে পাশবালিশ নেবে, সেটাকে গদাস্বরূপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাকিদের মারবে, কোনো দল নেই, ফ্রি-ফর-অল, যে যাকে ইচ্ছে মারতে পারে। সবাই চশমা খুললাম, কোলবালিশ চয়ন করে গদার মত দু'তিনবার মাথার ওপর ঘুরিয়ে নিলাম, ঘরের সব দরজা বন্ধ করা হল, সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে একে ওপরকে ঠাউর করতে লাগলাম, স্যুইচবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে "রেডি, স্টেডি, গো" বলে শ্রেয়ার্থ ঘরের আলো নেবালো। দেবদীপ অনেকক্ষণ ধরেই আমাকে চোখে চোখে রাখছিল, আমি জানতাম অন্ধকার

হলেই দেবদীপ আমার দিকেই তেড়ে আসবে (আমাদের বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক কি না), কিন্তু তার সাথে এটাও জানতাম শারীকির শক্তিতে দেবদীপের সাথে কুলোতে পারবো না , তাই ঘরের একটা কোণা আমি নজরবন্দী করেছিলাম, আলো নিবতেই এক ছুটে পৌঁছে গেলাম সেই কোণাতে। গিয়ে দেখি কোণায় লুকিয়ে থাকার বুদ্ধি কেবল একা আমার হয় নি, আমার আগে থেকেই কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে। এদিকে আলো নেবানোর পরে ঘর অন্ধকার হয়েছে বটে, কিন্তু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়, সকলকেই আবছা বোঝা যাচ্ছে, দেবদীপ সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখেছে আমাকে কোণায় ছুটে যেতে, তাই দেবদীপ বালিশ হাতে ছুটে এসেছে সেই কোণায়। তাই অগত্যা কোণায় পূর্বদণ্ডায়মান ব্যক্তিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে নিজের জায়গায় করলাম, তারপর তাকেই জাপটে ধরে নিজের ঢাল বানালাম, আর তৎপরবর্তী মিনিটখানেক আমার হিউম্যান শিল্ডের ওপর দেবদীপের প্রবল গদাবর্ষণ হল। ঘরের অন্যদিকে শ্রেয়ার্থ আর সায়ন শান্তিতে নিজেদের মারপিট মিটিয়ে যখন ঘরের আলো জ্বাললো, তখন সব চরিত্রের পরিচয় স্পষ্ট হল, প্রিয়ক ছাড়া আমাদের বাকি সকলের (বিশেষত আমার) ভারি মজা হল।

আমার বাড়িতেও অনেকবার অনেকে এসেছে - এলেই খাওয়াদাওয়া হত, সকালে এলে শ্রীহরির রাধাবল্লভী আর মাটির ভাঁড়ে ছোলার ডাল, বিকেলে এলে মুড়ি আর আপনজনের তেলেভাজা, সাথে উজ্জ্বলার চানাচুর, মিষ্টি সবসময়েই হত, জিলিপি বা মিষ্টি দই। একবার ঘরের ভেতরে আমরা দই খেয়ে ফাঁকা দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ক্যাচ-ক্যাচ খেলেছিলাম, ক্যাচ ফস্কালে মেঝেতে পরে ভাঁড় চৌচির হচ্ছিল, তাতে বেশ উত্তেজনা বাড়ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে মাঝে মধ্যেই অন্যদের ফোন করা হত, সেটা সেলফোন কলার আই-ডির যুগ ছিল না, শান্তিতে প্র্যাঙ্ক ফোন কল করা যেত। দেবদীপের ফার্স্ট বয় রুদ্রজিৎ পালের ওপরে একটা আলাদা টান ছিল (স্কুলে একবছর স্ক্র্যাপবুকের জোয়ার এসেছিল, তাতে একটা প্রশ্ন ছিল, "ইয়োর ফেভারিট প্যাল", দেবদীপ লিখেছিল, "রুদ্রজিৎ পাল"), তাই রুদ্র পালকে প্রচুর ফোন করা হত। একবার দূর্গাপুজোর আগে আমার বাড়ি থেকে রুদ্রজিৎকে ফোন করে দেবদীপ বলেছিল, "রুদ্র পাল বলছেন কি ? আমি দক্ষিণ সংঘ থেকে বলছি। আপনি কি এবার আমাদের ক্লাবের মূর্তি বানাবেন ?" (পাঠককে মনে করিয়ে দি, নব্বইয়ের দশকের কলকাতার প্রখ্যাত মূর্তির কারিগর ছিলেন রুদ্র পাল।)

স্কুলজীবনে প্রচুর নাটক করেছি, ক্লাসরুমেই করতাম, কোনো একটা সুযোগ পেলেই হল (টিচার্স ডে, হাফ ইয়ার্লির ফলঘোষণার আগের দিন, ইত্যাদি)। সন্দীপ তো ছিলই, সে পরে অন্য হুজুগেদের সাথে নাটকের গ্রুপ করে স্টেজে নাটক করেছে, তা ছাড়াও আমি, সায়ন, প্রিয়ক, দেবদীপ, শ্রেয়ার্থ, অনির্বাণ, প্রভৃতি জুটে যেতাম। দেবদীপ ছিল নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেবদীপ চিরকালই নাটুকে ছিল, সব কথাই নাটকীয় ভঙ্গীতে বলতো; যেমন আমাকে সবসময়ে "তুমি" বলে সম্ভাষণ করতো (বাকি সকলে আমাকে "তুই" বলতো, আমিও সবাইকে "তুই" বলতাম, দেবদীপকেও, কেবল দেবদীপ আমাকে "তুমি" ডাকতো) - অনেকবার কারণ জানার চেষ্টা করেছি, জানতে পারি নি, এখন আর কোনোদিনই জানতে পারবো না।

দেবদীপের একটা সোলো পার্ফর্মেন্স মনে আছে। পারমিতা আন্টিকে প্রেমপত্র লেখার পরের দিনের ঘটনা। পাঁচতলার ঘরগুলোর ওপরের সারির জানলাতে গ্রিল থাকতো না। টিফিন পিরিয়ডে দেবদীপ বেঞ্চে চড়ে তলার জানলাগুলো বেয়ে ওপরের জানলাগুলো খুললো, আর খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে অবিকল ধর্মেন্দ্রোচিত ভঙ্গীতে "শোলে" থেকে জলের ট্যাঙ্কির পুরো ডায়লগ বললো, হাতে একটা স্টিলের বোতলও ছিল (অনেকের ধারণা তাতে জল ছিল, তবে সে ব্যাপারে আমার ভিন্ন অভিমত)। আমাদের সময়ে সকলের হাতে হাতে ফোন থাকতো না, তাই ফোনের ছোট স্ক্রিনে ভিডিও তুলে মুহূর্তটাকে নষ্ট করি নি, প্রাণভরে সবাই উপভোগ করেছিলাম, প্রচুর হাততালি পড়েছিল। আমরাও অল্পবিস্তর যোগদান করেছিলাম, শুভঙ্কর অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, "ভাইসাব, ইয়ে সুইসাইড ক্যয়া হোতা হ্যায় ?", আমিও তার যথাযত উত্তর দিয়েছিলাম।

মনে পড়ে, অষ্টম শ্রেণীতে নাটক করেছিলাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "ভাড়াটে চাই", সায়ন মুখ্য চরিত্র, সে এক ভাড়াটে খুঁজছে, তার ভাইপো দেবদীপ। আমি ছিলাম পাড়ার জনৈক ভদ্রলোক, সায়নের ফাঁকা ঘরটাকে বিনামূল্যে পাড়ার ক্লাবঘর বানানোর ফন্দিতে আছি, নাটকের দিন, আমি, সায়ন, আর দেবদীপ যখন একসঙ্গে মঞ্চে, আমি সায়নকে বলছি, "আপনি হলেন আমাদের পাড়ার দাদা -", তখনি হঠাৎ করে দেবদীপ উত্তর দিল, "এবার তো পাড়ার দাদুও বলবেন"। দেবদীপ এরকম মাঝে মধ্যেই টুকটাক নিজস্ব উক্তি সংযোজন করতো, রিহার্সলে করতো না, একদম দিনের দিন করতো, মন্দ হতো না, খুব হাততালি পেত, দর্শকবৃন্দ সেগুলোই দেখতে বেশি পছন্দ করতো বোধ করি। সন্দীপ ছিল পাগল, পরবর্তী দৃশ্যে সে এসে সায়নের ওপর ক্ষোভপ্রকাশ করছে, শেষে সায়নকে মহম্মদ বিন তুঘলক বলে সন্দীপের প্রস্থান, তারপরে দেবদীপ সায়নের দিকে

তাকিয়ে বিচলিত কন্ঠে বললো, "কী পাগল রে বাবা, কীসব ইনজামাম-উল-হক টুল-হক বলে চলে গেল ?"

আমি যখন নাটক পরিচালনার ভার নিলাম, ঠিক করলাম নিজেরাই স্ক্রিপ্ট লিখে নাটক করবো। ভালো গল্প লেখার ক্ষমতা ছিল না, তাই রাজশেখর বসুর থেকে গল্পগুলো ধার করার আয়োজন করলাম। এটা খুব একটা অভিনব চিন্তাধারা নয়, আমাদের আগে সত্যজিতবাবুও পরশুরামের থেকে (একাধিক গল্প) ধার করেছেন, তবে আমরা ঠিক করলাম অন্য কোনো গল্প নিয়ে নাটক করবো। (কলেজজীবনে হুজুগেরা যদিও স্টেজে "বিরিঞ্চিবাবা" করেছিল।) একাদশ শ্রেণীতে করলাম "চিকিৎসা বিভ্রাট", এটার স্ক্রিপ্ট লেখাই ছিল কারণ এই নাটকটা মা করিয়েছিল গোখেল কলেজে মায়ের ছাত্রীদের নিয়ে - বেশীরভাগ ডায়লগই রাজশেখর বসুর থেকে হুবহু টোকা (রাজশেখর বসুর ওপর সর্দারি মারবার আমরা কে ?), শুধু একটু কাঁটাছেঁটা করে এপাশ-ওপাশ করা। কিন্তু নাটক করতে গিয়ে বুঝলাম, অনেক চমৎকার লাইনই বাদ পড়ে যাচ্ছে, কোনোমতেই কোনো চরিত্রের মুখে সেগুলো বসানো যাচ্ছে না, অগত্যা একটা ন্যারেটর জোগাড় করতে হল, আমরা সম্মিলিতভাবে নির্দ্বিধায় দ্বৈপায়নকে চয়ন করলাম ন্যারেটররূপে, দ্বৈপায়নের ছিল একটা ন্যারেটরমার্কা চেহারা আর আরো বেশী করে একটা ন্যারেটরোচিত ভাবভঙ্গী (আজো আছে), তাই ন্যারেটর হিসেবে দ্বৈপায়নকে অতি চমৎকার মানালো - সেই থেকেই দ্বৈপায়ন হয়ে গেল আমাদের সব রাজশেখর বসুর নাটকের ন্যারেটর।

এরকম গল্প, নাটক, দুষ্টুমি, এসবের মাঝেই ধীরে ধীরে স্কুলজীবনের অবসান ঘটলো। স্কুলের শেষ দিনে খুব উৎসব হল, সঙ্গীতজ্ঞরা গান গাইল ("পুরোনো সেই দিনের কথা" ইত্যাদি, পার্থবাবু ভরদুপুরে গাইলেন "এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়"), গিটারজ্ঞরা গিটার বাজালো ("জামাইকান ফেয়ারওয়েল", মল্লার রায় নন-কনফর্মিজমের প্রাণোচ্ছ্বাসে গাইলেন "লিটল বক্সেস অন দ্য হিলসাইড"), একে অপরের জামায় সই করা হলো, টপটপ করে চারদিকে অনেক চোখের জল পড়লো - বেশ ঝরোঝরো বারিধারা। আমরা কেবল নাটক করতে পারতাম, তাই আমরা দুটো নাটক করলাম। প্রথম নাটক ছিল "কর্ণ কুন্তি সংবাদ ২", কাব্যনাট্য, কর্ণ কুন্তি সংবাদের আধুনিক সংস্করণ, তাতে ছিল কেবল দুটো চরিত্র, কর্ণ দ্বৈপায়ন, কুন্তি মহামায়া। পরের নাটক ছিল রাজশেখর বসুর "বটেশ্বরের অবদান"। (আমরা ইচ্ছে করে সত্যজিত রায়ের অব্যবহৃত গল্পগুলো করতাম, কিন্তু মজার ব্যাপার, ক'দিন আগে দেখলাম সন্দীপ রায় "বটেশ্বরের অবদান" নিয়ে সিনেমা করেছেন।) আমি হলাম বটেশ্বর, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, একটা পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি, তাতে মৃত্যুপথগামী ট্র্যাজিক চরিত্র অলকা, সেটা পড়তে পড়তে সত্যিকারের অলকানামক একটি অসুস্থ মেয়ের ধারণা হয়েছে আমার উপন্যাসের অলকা বাঁচলেই সে বাঁচবে, নচেৎ নয়, তাই একে একে অলকার স্বামী, বাবা, শ্বশুরমশাই, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী, বিভিন্ন অছিলায় বিভিন্ন গল্প বানিয়ে আমার কাছে আসছে, আমার উপন্যাসের অলকাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেওয়ার মিনতি, অনুরোধ, আদেশ নিয়ে - অনেকটা ও-হেনরির "লাস্ট লিফ"-এ পরশুরামের ছোঁওয়া। আবার দ্বৈপায়ন ন্যারেটর, মহামায়া অলকা, প্রিয়ক তার স্বামী, সুমন তার বাবা, শুভঙ্কর তার শ্বশুর, সায়ন প্রতিবেশী, আর অনির্বাণ আর দেবদীপ পাড়ার দুই গুণ্ডা। এটা আমার সাউথ পয়েন্টের শেষ দিনের শেষ নাটক, তাই কিছু লোকের নাটকে থাকার চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল - যেমন আমার সাউথ পয়েন্ট জীবনের দুই চিরসঙ্গী প্রিয়ক আর অনির্বাণ; আমার স্কুলজীবনের ধ্রুবতারা সায়ন, সায়ন তখন প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে ছিল, কারুর সাথেই কথা বলতো না, কোনোভাবেই নাটক করার মানসিকতায় ছিল না, রীতিমত গায়ের জোরে সায়নকে রাজি করালাম, ধমকি দিলাম সায়ন নাটক না করলে দেবদীপকে দিয়ে স্কুলের শেষ দিনের সমস্ত অনুষ্ঠান বানচাল করিয়ে দেবো; আর দেবদীপ, দেবদীপ ছাড়া কী করে নাটক করবো, দেবদীপ মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজশেখর বসুর লেখার ওপর নিজের কারিগরি না করলে কী করে হবে, দেবদীপ ছিল মূল আকর্ষণ, দেবদীপ না থাকলে দর্শক হাততালি দেবে কাকে ? ততদিনে দেবদীপের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে, হাততালির লোভে, আমিও স্ক্রিপ্টে রাজশেখর বসুর ওপর টুকটাক কাজ চালাতাম, স্থানকালপাত্রনির্ভর অনেক উক্তি সংযোজন করেছিলাম, যেমন "পড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়" (তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন), "জামির খান" (আমির খান আর জামির লেনের মেলবন্ধন), "নতুন জেনরেশনের ইয়ং চ্যাপ" (বাসের শেষ বেঞ্চে বসে হৈ-হুল্লোড় করে বাড়ি ফিরতাম, একদিন এক সংস্কৃতিবান বাস-আরোহী কণ্ডাক্টরকে আমাদের ব্যাপারে নালিশ করেছিলেন, কিন্তু কণ্ডাক্টর তো আমাদের বন্ধু, আমাদের বিরুদ্ধে অচেনা উন্নাসিকতা সে মেনে নেয় নি, উত্তর দিয়েছিল, "নতুন জেনরেশনের ইয়ং চ্যাপ, এটুকু তো করবেই", তার পর থেকেই সেই অমর বাক্য হয়েছিল আমাদের প্রাণমন্ত্র)। তবুও দেবদীপকে নিয়ে ভয় ছিল, স্টেজে দাঁড়িয়ে নিজস্ব কোন নতুন ডায়লগ উদ্ভাবন করবে, তার আশঙ্কায় ছিলাম; নাটকে দুটো গুণ্ডার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় গুণ্ডা অনির্বাণের মূল দায়িত্ব ছিল দেবদীপকে সামলানো, আর যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে কোনোমতে টেনে হিঁচড়ে স্টেজ থেকে নামানো। এত সতর্কতা সত্ত্বেও দেবদীপ এক দু লাইন নিজের যোগ করেছিল, আমি যখন বললাম "সব শেয়ালের এক রো", দেবদীপ টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "আমি কি শেয়াল নাকি ?" আর পকেট থেকে ল্যাজরূপক রুমাল বার করে প্রশ্ন করলো, "আমার কি লেজ আছে ?" আর বলা বাহুল্য, তাতেই সর্বোচ্চ হাততালি পেল। (এই নাটকের একটা ভিডিও আছে, পাঠক যদি

সেটা দেখে থাকেন, তাহলে হয়তো দেবদীপের জনপ্রিয়তার হাল্কা আভাস পাবেন, শুনবেন দেবদীপের স্টেজে প্রবেশপথে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চকিত অট্টহাস্য, দেখবেন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অরুণিমার মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপার ব্যর্থ প্রয়াস, প্রত্যক্ষ করবেন কী পরম নিষ্ঠা সহকারে অনির্বাণ তার দায়িত্ব পালন করেছে, অল্প হলেও উপলব্ধি করবেন দেবদীপের অদম্য অভিনব প্রাণশক্তি।) সেই ছিল দেবদীপ, সায়ন, প্রিয়কের সাথে আমার শেষ নাটক। নাটক শেষে প্রচুর হাততালি পেলাম, অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা দেখতে এসেছিলেন, ভালো বলেছিলেন, মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ পাল খুব প্রশংসা করেছিলেন, আর বিশেষ করে চিরুনিবাহক দেবদীপকে বাহবা দিয়েছিলেন।

আমাদের স্কুলজীবন জুড়ে এরকম আরো কত ছোট ছোট গল্প আছে, যারা স্কুলের নাট্যমঞ্চে সেদিন উপস্থিত ছিল, তাদের কাছে সেগুলো ভারি আনন্দের সামগ্রী, আর যারা ছিল না, তাদের কাছে অত্যন্তই সাধারণ সেই গল্পগুচ্ছ, তাদের কিছু মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে না, সব যেন কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে এক সম্মিলিত সুখময় স্মৃতির অস্পষ্ট অবয়ব গঠন করে। এরকম করেই আনন্দে, দুঃখে, ভয়ে, নির্ভয়ে, উচ্ছ্বাসে, বৈরাগ্যে, স্কুলজীবন কাটিয়েছি। কত কত বন্ধু হয়েছে, কত কত বন্ধুর বৃত্ত হয়েছে, তাদের সাথে কত কত সুখ দুঃখ ভালোবাসার সঙ্গী হয়েছি। সেরকমই এক বিশেষ বন্ধুবৃত্তে অবিস্মরণীয় কিছু দিন কাটিয়েছিলাম আমি, সায়ন, প্রিয়ক, আর দেবদীপ। আমাদের সেই চারমূর্তির তিনজন আজো সেই অটুট বন্ধনে বাঁধা, আমি লস এঞ্জেলেসে (এই হলিউডের পাশে আর কি, কিএনু রিভসের সাথে চা-বেগুনি খাই), একজন সুইটজারল্যাণ্ডে (এই করণ যোহরকে আল্পস পর্বতশ্রেণী ভাড়া দেয় শুটিঙের জন্য), আর একজন মাতৃদেশে (তবে মাতৃশহরে নয়, বেঙ্গালুরুতে, এই রজনীকান্তের সাথে লুঙ্গি ডান্স করে), প্রকৃতার্থেই পৃথিবীর তিন প্রান্তে, তবুও অল্প ফোনে, আর বাকিটা ফেসবুকে, কথা হয়, জীবনের রঙের ছোঁওয়া লাগে একে অপরের ক্যানভাসে। শুধু দেবদীপ এগিয়ে গেছে তার পথে, দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত ফোনের ওপারে, ফেসবুক ওয়াটসএপের সীমানা ছাড়িয়ে।

স্কুল ছাড়ার পরে দেবদীপের সাথে আরো দু'বার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার দেখা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে - আমাদের স্কুল থেকে প্রতিবছর প্রায় শ'খানের ছাত্র যেত যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ার হতে, সেই জনস্রোতে দেবদীপ, সায়ন, প্রিয়ক, তিনজনেই ছিল। আমি তখন বেঙ্গালুরুতে অঙ্ক পড়ি, আমাদের গরমের ছুটি পড়ে গেছে, যশবন্তপুর এক্সপ্রেস ধরে বাড়ি চলে এসেছি, যাদবপুরে তখনো ছুটি পড়ে নি, স্কুলের বন্ধুদের সাথে দেখা করবার লোভ সম্বরণ না করতে পেরে সটান চলে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। (এরকম আগে ছুটি পড়ে গেলে বন্ধুদের সাথে দেখা করবার জন্য অনেকবার অনেক জায়গায় ড্যাং ড্যাং করে চলে গেছি, অভিস্নাতর সাথে দেখা করতে নীলাদ্রি আর আমি মেডিক্যাল কলেজে গেছি - জীবনানন্দ দাশ পড়ে মেডিকেল কলেজে লাসকাটা ঘর দেখার একটা বিশেষ আকর্ষণও ছিল, রাহুল আর শুভ্রশেখরের সাথে দেখা করতে বরানগর আয়েসাইতে তো প্রায়শই যেতাম, গিয়ে একাধিক লেকচারও শুনেছি।)

যাদবপুরে কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের ল্যাবে বসে সায়ন আর দেবদীপের সাথে পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি রোমন্থন করলাম, তারপর মেকানিকালের লোকজন ডেকে নিয়ে গেল, প্রিয়কের সাথে চলে গেলাম মেকানিকালের একটা ক্লাস করতে, সঙ্গ দিতে দেবদীপ আর সায়নও এলো। কলেজে ছাত্ররা সাধারণত ক্লাস বাঙ্ক করে, আমরা তিনজন বাড়তি ক্লাস করলাম ! মনে হল এহেন ব্যতিক্রমী ঘটনার পর্যাপ্ত পরিমাণে সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাই ঠিক করলাম আমি, সায়ন, আর দেবদীপ কোনো তিন বাঙ্কারের হয়ে প্রক্সি দেবো; সায়ন আর দেবদীপ নিশ্চিন্তে প্রক্সি দিলো, কিন্তু আমি প্রায় ফেঁসেছিলাম আর কি - "প্রেজেন্ট" বলে যখন কোনো জনৈক বাঙ্কিংরত ছাত্রর হয়ে প্রক্সি দিলাম, শিক্ষক থমকে গেলেন, আমাকে দাঁড় করালেন, আর ভালো করে সামনে এসে পর্যবেক্ষণ করলেন - পরে জেনেছিলাম, যার হয়ে প্রক্সি দিয়েছিলাম, সে ততদিনে একদিনও ক্লাস করে নি, তাই তাকে প্রথমবার ক্লাসে পেয়ে শিক্ষক তার (অর্থাৎ আমার) মুখটা চিনে নিয়েছিলেন।

যাদবপুরেও দেবদীপ তার কার্যকলাপ বজায় রেখেছিল। প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষা, দেবদীপের যথারীতি কোনো লেখাপড়া করা হয় নি, তাই আগের সন্ধ্যাবেলা ল্যাবে প্র্যাক্টিস করতে গেল। আরো অনেকেই এসেছিল, দেবদীপ তাদের সাথে অনেক রাত অবধি ল্যাব করলো। রাত বাড়তে লাগলো, ধীরে ধীরে এক এক করে বাকি সব ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি চলে গেল, দেবদীপ শেষ পড়ে রইলো। পরদিন সকালে ল্যাবের বাইরে বিশাল হইচই - ল্যাবের সেই মোটা ভারী লোহার তালা কোনোমতেই খোলা যাচ্ছে না, দারোয়ান বিভিন্ন চাবি প্রয়োগ করছে, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই বৃথা হচ্ছে। ক্ষনিক বাদে দেবদীপও এল, কাঁচুমাচু মুখে প্রশ্ন করল, "কী

ব্যাপার, কী হয়েছে, ল্যাব খুলছে না ?" (আসল গল্প: দেবদীপ আগের রাতে অবিকল ল্যাবের তালার মত একটা নিজস্ব তালা নিয়ে এসেছিল, সবাই চলে যাওয়ার পরে দেবদীপ নিজের তালায় ল্যাব বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে, রাতে টহল দেওয়ার সময়ে ল্যাবের ওপরে ঐ তালা দেখে দারোয়ানের মনে কোনো সন্দেহ হয় নি, তারপর পরদিন সকালে গিয়ে এই কাণ্ড।) বলা বাহুল্য, সেই তালা আর সময়ের মধ্যে খোলা গেল না, সে দিনের মত পরীক্ষা বাতিল হল।

মেকানিকালে ক্লাস করে দেবদীপের সাথে আলাদা করে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ততদিনে প্রিয়ক আর সায়নের সাথে দেবদীপের বন্ধুত্বের টানে ভাটা পড়েছে - যাদবপুরে দেবদীপের নতুন কিছু বন্ধু হয়েছিল। দেবদীপ তার "চেম্বার" (ওরফে পিস্তল)-এর কথা বললো, আমি নির্লিপ্ত রইলাম। এতদিনে এটুকু শিখেছিলাম যে দেবদীপকে কিছু বললে তার হিতে বিপরীত হয় - অষ্টম শ্রেণী থেকে দেবদীপ স্কুলের ছাদে গিয়ে সিগারেট খেতো, আমি অনেক বকে থামানোর চেষ্টা করতাম, তারপর দশম শ্রেণীতে দেবদীপ হঠাৎ একদিন এসে ঘোষণা করল, "আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি"। শুনে খুব খুশি হলাম, কিন্তু পরে জানলাম সিগারেট ছেড়ে গাঁজা ধরেছে। তখনো আমার আশা ছিল, আবার পড়লাম দেবদীপের পেছনে, এবার গাঁজা ছাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। স্কুল ছাড়ার মধ্যে দেবদীপ গাঁজাও ছেড়ে দিল, তারপর জানলাম যাদবপুরে দেবদীপ গাঁজা ছেড়ে গাঁজার সাপ্লায়ার হয়েছে (সে হেতুই দেবদীপের চেম্বার)। তাই আর গাঁজার ব্যবসা বা পিস্তল ছাড়ানোর চেষ্টা করি না, শেষে বন্দুক ছাড়াতে দিয়ে দেখবো কালাষ্ণিকভ নিয়ে হাজির হয়েছে।

স্কুল ছাড়ার পরে দেবদীপের সাথে দ্বিতীয় এবং শেষবার দেখা হয়েছিল আমেরিকার রেডমন্ট শহরে। আমি তখন য়ুনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছি, আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতো সিয়াটল শহরের মার্সার দ্বীপে, ছুটিতে সেখানে বেড়াতে গেছিলাম। অনতিদূরেই রেডমন্টে দেবদীপ তখন কম্প্যুটারে চাকরি করছে, ছেলেবেলা থেকেই কম্প্যুটার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, তাই কম্প্যুটার পেশায় দেবদীপকে ভালোই মানিয়েছিল। শুভ্রশেখরও তখন রেডমন্টে, মাইক্রোসফ্টের অফিসে বসে অঙ্কশাস্ত্রচর্চা করছে। এক বিকেলে আমরা তিনজনে দেখা করলাম রেডমন্টের এক রেঁস্তোরায়।

শুভ্রশেখরের সাথে আমার স্কুল থেকেই আলাপ - আত্মিক যোগস্থাপন হয়েছিল পরনিন্দার টানে, আমরা দু'জনে মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম "বিশ্ব নিন্দু পরিষদ" - আমরা ছিলাম বাজপেয়ীপ্রেমে ভাজপাভক্ত, সেই সূত্রেই এই নামকরণ। (আমাদের সময়ে তরমুজ কথাটা বেশ চলতো, বাইরে সবুজ ভেতরে লাল, আমি শুভ্রকে মস্করা করে কুমড়ো বলতাম, বাইরে সবুজ ভেতরে গেরুয়া, আর শুভ্র ভালোবেসে আমাকে পেঁপে বলতো, বাইরেও গেরুয়া ভেতরেও গেরুয়া।) আমাদের বিশ্ব নিন্দু পরিষদে মোটে চার সদস্য ছিল, আমি, শুভ্র, আর আমার কলেজের দুই বন্ধু, সোমনাথ আর শিল্পক। "যেখানে দেখিবে ছাই, খুঁজিয়া দেখিয়ো তাই" মন্ত্র উচ্চারণ করে আমরা চার নিন্দুক মিলে প্রাণপণে অর্কুটের স্ক্র্যাপে নোংরা ঘাঁটতাম, আর তাৎপর্যমূলক কিছু আবিষ্কার করলে, সেটা নিয়ে জমিয়ে পরনিন্দা-পরচর্চা করতাম। (পরনিন্দা নিয়ে পাঠকের কোনো বক্তব্য থাকলে, তাঁকে বলবো রবিবাবুর "পরনিন্দা"-নামক একটি প্রবন্ধ পড়তে, তাতে স্পষ্ট হবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পরনিন্দার মাহাত্ম্য বুঝেছিলেন।) পরনিন্দায় মন না ভরলে, মিল করে করে ছড়াও লিখতাম, ঘুরে ফিরে একটা চরিত্র নিয়েই লিখতাম, তার সংকেত নাম ছিল "গতানুগতিক পথের পথিক" (নামকরণের সার্থকতা বিশ্লেষণ করা যাবে না, ক্ষুরধার পাঠককে সন্ধিবিচ্ছেদ করে নিজে থেকে অনুমান করে নিতে হবে)। তাকে নিয়ে শুভ্রর লেখা একটা ছড়ার দু'লাইন আজ প্রাসঙ্গিক -

কেহ কি জানিত হায়, দীপজ্বলা সন্ধ্যায়, লাগিয়াছে দেবতার গ্রাস ?
বাবু দাস খেত ঘাস, হয়ে গেল কী বেফাঁস, টেক্কা মারার সেরা তাস।

এ ছড়ারও ভাব সম্প্রসারণ করা যাবে না, শুধু এটুকু জানাতে পারি যে এই পংক্তিদ্বয়ের প্রথম লাইনের প্রধান চরিত্র দেবদীপ - আমাদের স্কুলের এক খ্যাতনামা ছাত্র অন্য স্কুলের এক খ্যাতনামা ছাত্রীর সাথে ফোনে প্রেম করতো, দেবদীপ ছেলেটার গলা নকল করে মেয়েটিকে ফোন করে তাদের প্রেমকাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়েছিল, ইতি দীপজ্বলা সন্ধ্যায় লাগিয়াছে দেবতার গ্রাস।

রেডমন্টের রেঁস্তোরায় বেশ জমিয়ে আড্ডা হলো। শুভ্রর কিছু কাজ ছিল, খাওয়াদাওয়া সেরে শুভ্রশেখর বেলভিউর বাসে উঠে পড়লো। আমি আর দেবদীপ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আরো খানিকক্ষণ গল্প করলাম - কত পুরোনো দিনের কথা, সেই পেনের ঢাকনায় শিস, সেই সৌম্যর ব্লেজারের বোতাম, সেই ফেনপথিলিনের শিষি, সেই গোবিন্দার গাড়িতে ধাওয়া, সেই সায়নের ছাদে ক্রিকেট, সেই পারমিতাকে চিঠি, সেই রাবণ পালের চিরুনি, সেই রুদ্র পালকে ফোন, সেই শেষের দিনের নাটক। দেবদীপ তখন ড্রাগের ব্যবসা ছেড়ে চুটিয়ে বডি-বিল্ডিং করছে, আমেরিকার দু'একটা বডি-বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় নামও দিয়েছিল, বললো প্রচুর পরিমাণে নুন খেয়ে শরীর থেকে জল নিষ্কাশন করছে, আর প্রচুর পরিমাণে স্টেরয়ড নিয়ে শরীরে মাংসপেশী তৈরি

করছে। আমি সেদিনও নির্বাক ছিলাম, চেন দিয়ে পাড়ার গুণ্ডাদের কাছে মার খেয়ে যা হয় নি, পঞ্চমীর দিনে দূর্গাপ্রতিমার নাক ভেঙে যা হয় নি, এক মাইল বাসের জানলা থেকে ঝুলতে গিয়ে যা হয় নি, বন্দুক পকেটে ড্রাগ কেনাবেচা করতে গিয়ে যা হয় নি, কী করে বুঝবো শেষে স্টেরয়ডের ওভারডোজে তা ঘটবে ? কী করে জানবো, সেই গোধূলিলগনেই আমার যা কথা ছিল সব সেরে নিতে হবে ?

হঠাৎই অতীত থেকে এক ঝটকায় বর্তমানে এসে দেবদীপ বললো, "তুমি দাঁড়াও, আমি একটু পেচ্ছাপ করে আসছি"। মার্কিন রাস্তায় এ এক মহা সমস্যা, এ হেন অবস্থায় সাধারণত ছুটে ছুটে স্টারবাক্সের কফির দোকান খুঁজতে হয়, কিন্তু দেবদীপ দেখি প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার পাশের এক গাছের গায়ে দাঁড়িয়ে গেল; আমি তো ভয়ে ছিটকে এলাম, পুলিস দেখলেই নির্ঘাৎ রিপোর্ট করে ডিপোর্ট করে দেবে। ঠিক তখনি দেখি এক মার্সারগামী বাস আসছে, সন্ধ্যেও হয়ে আসছিল, "দেবদীপ, আমি চলি" বলে এক ছুটে উঠে পড়লাম সেই বাসে। মাইক্রোসফ্টের ঝকঝকে রেডমন্টের সেই স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, সাড়ে আটটার গোধূলির শেষ রশ্মিপাত তখনো ছুঁয়ে যাচ্ছে পাশের সিয়াটল শহরের ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা টাওয়ারের শিখরে, পথপাশে সুসজ্জিত তরুশ্রেণীপরে প্রস্রাবরত দেবদীপ, সেই আমাদের শেষ দেখা।

সংস্কৃত দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানেই শেষ করি। চাণক্যর অনেকগুলো শ্লোক মুখস্থ করতে হয়েছিল আমাদের। অনেক তাবড় তাবড় কথা লিখে গেছেন চাণক্য, সুতরাং মুখস্থ করতে বেশ মজাই হয়েছিল, আর তাই এখনো মনে আছে। শেষ পংক্তিটা মনে পড়ে,

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলং মিদং সর্ব্বং কীর্তিযস্য স জীবতি॥